কবীর চৌধুরী

বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

দূষণ ঃ কেশোরাম রেয়ন

বায়োটেকনোলজি—এদেশে

জনৈক বিজ্ঞানীর নিবেদন

তরোয়াল থেকে কাস্তে

লিউকাস এয়ারোস্পেস—নতুন পথের খোঁজে

মিনামাতা

বিজ্ঞানের সমাজতত্ত্ব

"ডার্টি' ডজন"

মে-জুন ও জুলাই-আগস্ট 1985

দাম তিন টাকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

অষ্টম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা নবম বর্ষ প্রথম সংখ্যা

মে-জুন জুলাই-আগষ্ট 1985

ঘরের কাছে দূষণ : কেশোরাম রেয়ন—শান্তনু ত্রিবেদী ☐ বায়ো-টেকনলজি—এদেশে—গৌতম ব্যানার্জী ☐ জনৈক বিজ্ঞানীর অন্তিম নিবেদন (—অনুবাদ : পার্থ সেন) ☐ তরোয়াল থেকে কাস্তে : লুকাস এয়ারোস্পেসের অভিজ্ঞতা (—অনুবাদ : মন্দ্রীনারায়ণ মজুমদার ☐ লুকাস এয়ারোস্পেসের নতুন অভিজ্ঞতা নতুন সম্ভাবনা—সুরঞ্জন কর ☐ মিনামাতা—পার্থ সেন ☐ বিজ্ঞানের ইতিহাস : অন্য আর একটি ছবি—লতিকা গুহ ☐ প্রচার অভিযানের নাম 'ডার্টি ডজন' ☐ পরিক্রমা ☐ বইপরিচিতি ☐

গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায় ☐ বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার বার টাকা ☐ প্রতিষ্ঠানিক চাঁদা—চল্লিশ টাকা ☐ বাংলাদেশের জন্য —ভারতীয় টাকায় কুড়ি টাকা ☐ বিদেশী গ্রাহকদের চাঁদা বার্ষিক কুড়ি ডলার ☐ এজেন্ট কমিশন : দশ কপির উপর পঁচিশ শতাংশ এবং একশ কপির উপর তেত্রিশ শতাংশ ☐ এজেন্সীর জন্য নীচের ঠিকানায় লিখুন।

যোগাযোগের ঠিকানা

প্রতি সোমবার সন্ধ্যা সাতটায় সেন্ট্রাল এভিনিউ ও বৌবাজার স্ট্রিটের সংযোগস্থলে বৌবাজার পোস্ট অফিসের বিপরীতে 52/9C বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা—700012 ঠিকানায় দোতালায় ডি. এস. এন্টারপ্রাইজের ঘরে ☐ প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় 2/1A আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা-9 (শুকিয়া স্ট্রীটে ঢুকে খোঁজ করুন) ☐ ডাকে যোগাযোগের ঠিকানা—অভিজিৎ লাহিড়ী, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, EC 106 সল্টলেক, কলকাতা-700064।

চিঠিপত্র

জন্মলগ্ন থেকেই 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মী'র সঙ্গে আমার পরিচয়। পত্রিকাটি হাতে এলে আমি আদ্যোপান্ত না হলেও অধিকাংশ লেখাই পড়ে ফেলি। এই অনধিক আট বছরের দীর্ঘ পরিচয়ে এর অনেক পরিবর্তনই আমার নজর করার সুযোগ ঘটেছে। লক্ষ্য করেছি পত্রিকাটি মুদ্রণ প্রমাদ থেকে অনেকাংশে মুক্ত হয়েছে, ভাষায় ও বক্তব্যে এসেছে ঋজু বলিষ্ঠতা, রচনা-শৈলীতে এসেছে পরিমার্জন। আরও একটি লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে বিষয়বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে। অনুমান করতে অসুবিধে হয় না যে এই ধরণের একটি পত্রিকা, শতকরা 90টি ক্ষেত্রেই যার স্বাভাবিক পরিণতি অকালমৃত্যু, সেটাকে বয়ঃসন্ধির কাছাকাছি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পেছনে একাগ্র নিষ্ঠার ইতিহাস আছে।

তবে সাম্প্রতিকতম সংখ্যাটিতে (অষ্টম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, 1985) পুনশ্চ মুদ্রণ প্রমাদের আধিক্যে বিস্মিত হলুম। আশা করি সচেষ্ট শ্রমের বিনিময়ে ভবিষ্যৎ সংখ্যাগুলোকে ত্রুটিমুক্ত রাখতে পারবেন। আর একটি জিজ্ঞাসা, —আপনারা কি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় অনুমোদিত বানান অনুসরণ করতে পারেন না? আমার আশা আপনারা সচেষ্ট হলে পত্রিকাটির বানান রাজ্যেও শৃঙ্খলা আসবে।

পরিশেষে একটি অনুরোধ —বর্তমান মূল্যমানের অনুপাতে বার টাকা গ্রাহক চাঁদা হয়ত কমই, তবু একটু কুণ্ঠার সঙ্গেই বলছি, এটা দশ ধার্য করা কি সম্ভব?

দীপঙ্কর ঘোষ
কলকাতা-9

বি-ও-বি'র কথা

ভূপালের বিষ গ্যাসে আক্রান্ত মানুষজন আর তাদের সহমর্মী বন্ধুরা সায়ানাইডের কবল থেকে মুক্তির জন্য অবশেষে নিজেরাই গড়ে তুলেছিলেন "গণ হাসপাতাল"। শুরুতে তাঁবু খাটিয়ে। ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানার চত্বরে জবরদখল করা জমিতে নিয়মিত থায়োসালফেট ইনজেকশন দেওয়া চলছিল। দিনে একশ জনকে। পর পর ছ' দিন ইনজেকশন নিতে হয়। শতকরা ষাট থেকে সত্তর জনের ক্ষেত্রে চমৎকার ফল পাওয়া যাচ্ছিল। ফলে দারুণ উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল।

কলকাতা থেকে জুনিয়র ডাক্তাররা গ্রুপ করে রিলে পদ্ধতিতে যাচ্ছিলেন ভূপালে। আর একজন এসেছিলেন বোম্বাই থেকে। এরাই গণ হাসপাতালের চিকিৎসক। বাদ বাকিকাজ বস্তিবাসীরা নিজেরাই হাত লাগিয়ে করে দিচ্ছিলেন সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি। ইউরিন কালচার করতে পরীক্ষাগারে দিয়ে আসা, সকলের হেল্‌থ রেকর্ড তৈরী করা, তারপর নির্দিষ্ট দিনে চেক করা, সবই চলছিল।

নিজেদের উদ্যোগ বলে যে যেভাবে পারেন সাহায্য করছিলেন। প্রথমে কিছুদিন তাঁবুতে কাজ চলে। তারপর সকলের স্বেচ্ছা-শ্রমে গড়ে ওঠে চালা ঘর। বিপুল উৎসাহে চলছিল সব। শুরু হয়েছিল 3রা জুন, দুর্ঘটনার ঠিক ছ'মাসের মাথায়। তারপরই জানলাম সেই দুঃসংবাদ। পুলিশ ওই গণ হাসপাতাল ভেঙ্গে দিয়েছে 24 শে জুন মধ্যরাত্রে।

যারা এই উদ্যোগে যুক্ত ছিলেন তাদের সকলকেই পুলিশ ওইদিন রাত্রে দেড়টা-দুটো নাগাদ শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে নিয়ে গেছে। মোট একত্রিশ জনকে ধরেছে। প্রথমে থানা লকআপে। তারপর সেণ্ট্রাল জেল। এর মধ্যে বস্তির জনা চারেক মহিলাও আছেন। ওনারা সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি ক্লিনিকের কাজ করতেন।

ফিরে আসি ক্লিনিকের কথায়। বিপুল উৎসাহ সঞ্চার হয়েছিল সকলের ভিতর। ভাবখানা, এতদিনে একটা কাজের মত কাজ হচ্ছে। বেশ জাঁক করে হয়েছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, "গণ হাসপাতালের" শিলান্যাস হয়েছিল উৎসাহের সাথে। শিলান্যাস করেছিল সুনীল কুমার রাজপুত নামে বারো বছরের এক বালক। গ্যাস দুর্ঘটনায় দুর্গত মানুষদের প্রতীক সে। বাবা মা সহ পরিবারের আটজনকে হারিয়েছে। এখন সে অনাথ।

এই উদ্যোগে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে আছে দেশের নানান প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন সংস্থা। আছে ভূপাল দুর্ঘটনার শেষে গড়ে ওঠা দুটি সংস্থা—জাহরেলী গ্যাস কাণ্ড সংঘর্ষ মোর্চা, নাগরিক রাহাত আউর পুনর্বাস কমিটি, বোম্বের ট্রেড ইউনিয়ন রিলিফ ফাণ্ড, ইউনিয়ন কার্বাইড কর্মচারী সঙ্ঘ, মেডিকো ফ্রেণ্ডস, ডাগ ফোরাম ইত্যাদি। এখানকার জুনিয়র ডাক্তার সংস্থা আশ্বাস দিয়েছিলেন রুটিন করে ক্লিনিকে কাজ করে আসবেন বিনা পারিশ্রমিকে।

ভূপালের পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের বিচারে এরা সকলেই দেশদ্রোহী। এদের বিরুদ্ধে চার্জ, এরা দেশের এবং রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক। লিফলেট বিলি করা হচ্ছে, এদের বিরুদ্ধে কুৎসা করে।—বলা হয়েছে এরা এণ্ডারসনের চর।

আসলে সত্যিই অন্যায় করেছে জনবিজ্ঞানের এই সব কর্মীরা। সংবাদপত্র, রেডিও, টি. ভি. থেকে ভূপাল প্রায় মুছে গেছে। বিমান-দুর্ঘটনা হয়েছে, তার ব্ল্যাক বক্স পাওয়া গেল কিনা তাই নিয়ে মানুষ প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন। আর এখনো এরা কিনা ভূপাল-ভূপাল করছে, বস্তির লোকদেরকে ইঞ্জেকশন দিচ্ছে, তাদের মেডিক্যাল রেকর্ড সংগ্রহ করছে। এরা ত' দেশদ্রোহী বটেই। ভূপাল সেণ্ট্রাল জেল এবং দেশের আরো অনেক জেল ত' এদের জন্যেই তৈরী। □

ঘরের কাছে দূষণ কেশোরাম রেয়ন

শান্তনু ত্রিবেদী

পশ্চিম বাংলার কেশোরাম রেয়ন কারখানা আর মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র রেয়ন—একইরকম দূষণের শিকার দু'জায়গার মানুষজন। একটি প্রতিবেদন। বিষয়ঃ বিড়লা গ্যাস।

কলকাতা থেকে পঞ্চান্ন কিলোমিটার দূরে হুগলী জেলার মগরা থানার অন্তর্গত নয়াসরাই গ্রামে অবস্থিত কেশোরাম ইণ্ডাস্ট্রিজ এণ্ড কটন মিল্‌স লিমিটেড। কারখানার এক ধারে কুন্তিঘাট রেল স্টেশন, ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লাইনে পড়ে। আর এক ধার দিয়ে বয়ে চলেছে হুগলী নদী।

কারখানা নামেই কটন মিল্‌স। আসলে তৈরী হয় রেয়ন আর স্বচ্ছ কাগজ। এই রেয়ন অন্যান্য সুতোর, যেমন তুলো, পশম, সিল্ক, পাট, বা অন্য কোন কৃত্রিম ফাইবারের, সাথে মিশিয়ে চকচকে ভাব আনা হয় কাপড়ে। রেয়নের কারখানা ভয়ানক দূষণকারী বলে পৃথিবীময় নিন্দিত। এই কারখানা থেকে ছড়িয়ে পড়ে ক্ষতিকর নানান বিষবাষ্প, যা নিয়ে আসে নানান বিপর্যয় ও দুঃখময় মৃত্যু। জমিকে করে বন্ধ্যা। অসুস্থ ও পঙ্গু হন হাজার হাজার মানুষ—কারখানার ভেতরে ও বাইরে।

এই কারখানা থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লেবার ডিপার্টমেণ্টকে লেখা একটি চিঠির খানিক অংশ পড়ে শোনাই—"দিনে পঞ্চাশ টন সালফিউরিক এসিড উৎপাদনক্ষম দু'টি প্ল্যাণ্ট আছে আমাদের কারখানায়। প্রতিবার চালানোর সময় এ থেকে বিপুল পরিমাণে সালফার ডাই-অক্সাইড ও সালফার ট্রাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরী হয়। এতে যে শুধু এসিড উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাই নয়, আশপাশের জনবসতির বায়ুমণ্ডলও দূষিত হয়।" এখানে কাজ করেন প্রায় হাজার চারেক মানুষ।

মধ্যপ্রদেশের নাগদায় অবস্থিত গোয়ালিয়র রেয়ন এণ্ড সিল্ক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর কারখানা। সেখানেও তৈরী হয় চকচকে রেয়ন ফাইবার। এই কারখানার চারপাশেও একই চিত্র। বহু বিক্ষোভ-আন্দোলনের শেষেও অবসান হয়নি দুর্দশার। এখানে কাজ করেন সাড়ে তিন হাজার মানুষ।

দুটি কারখানারই একই মালিক—বিড়লা গোষ্ঠী। কারখানার ধারে কাছে যে কোন লোক গেলেই দেখতে পাবেন আশেপাশে ছড়ানো ঝলসানো পোড়া তাল, নারকেল, কুল, আম, পেয়ারা গাছ। দেখা যাবে এসিডে ক্ষয় যাওয়া বাড়ীর দেওয়াল, ঝকঝকে কাঁসা পেতলের বাসনের ওপর কালো কালো ছোপ, মন্দিরের চূড়োয় জমাট কালো দাগ। দেখতে পাবেন এসিডে সংপৃক্ত হয়ে যাওয়া বন্ধ্যা পুকুর, যার জলে মাছ ত বাঁচেই না, এমন কি কাপড়ও কাচা যায় না—রঙ নষ্ট হয়ে যায়, ফেঁসে যায়। নাকে আসবে গ্যাসের ঝাঁঝালো গন্ধ। নাগদার লোকেরা এ গন্ধকে 'আদর' করে ডাকে 'বিড়লা গ্যাস' নামে। কুন্তিঘাটের মানুষের কাছে এখনও এটি শুধুই 'গ্যাস'। এ গন্ধকে ওরা ঘৃণা করে, ভয় করে, কারণ এর থেকে নিস্তার নেই বাচ্চা বুড়ো, ছেলে-মেয়ে, শিক্ষিত অশিক্ষিত, দক্ষিণপন্থী-বামপন্থী কিংবা ধনী-দরিদ্র, কোনও মানুষেরই। এসবের শুরু সেই 1959-এ, কারখানা প্রতিষ্ঠা হওয়ার সময় থেকেই।

রেয়ন তৈরীর দু'এক কথা

কাঠের মণ্ড (বা পাল্প)-কে কস্টিক সোডায় ভিজিয়ে মেসিনে ক্ষারীয় সেলুলোজে পরিণত করা হয়। তারপর কার্বন ডাই সালফাইডের সাথে বিক্রিয়া করিয়ে তৈরী হয় সেলুলোজ জ্যানথেট। মধুর মত ঘন এই তরলকে "ভিসকোজ রেয়ন" বলে। এই ভিসকোজকে সালফিউরিক এসিড বাথে চোবানো সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত স্পিনারেটের মধ্যে দিয়ে চালনা করে ফাইবারের আকার দেওয়া হয়। এর ব্যবহার পোষাক, পরদা, কার্পেট, টায়ার প্রভৃতিতে। এর প্রচলন শুরু ইউরোপে প্রায় শ'খানেক বছর আগে। এই রাসায়নিক শিল্প অনিয়ন্ত্রিত হলেই হয়ে ওঠে কুখ্যাত পরিবেশদূষক। কেননা, এ থেকে কার্বন ডাই-সালফাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, ও ট্রাই-অক্সাইড, কার্বোনিল সালফাইড, সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন, সালফিউরিক এসিড প্রভৃতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষতঃ বাতাস যে দিকে বয়।

নাগদার মত নয়াসরাইতেও আছে কার্বন ডাই-সালফাইড প্ল্যাণ্ট (দৈনিক উৎপাদনক্ষমতা 18 টন), সালফিউরিক এসিড প্ল্যাণ্ট (দৈনিক 60 টন), সোডিয়াম সালফেট প্ল্যাণ্ট। আর আছে ট্রান্সপ্যারেণ্ট পেপার প্ল্যাণ্ট। এখানে 'ময়েস্চার প্রুফ্' পেপারও তৈরী হয়। তাছাড়া এখানকার 'বস্ত্রশিল্প' রাসায়নিক দ্রব্যাদিও (CS_2, H_2SO_4) বিক্রী করে।

তত্ত্বগত ভাবে, ভিস্‌কোজ তৈরীর প্রতিটি স্তরে পরিত্যাজ্য বস্তুগুলোর পুনর্ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকায় এতটুকুও দূষণের সম্ভাবনা থাকার কথা নয়। কাগজে-কলমে ব্যবস্থা সুন্দর। সুতরাং পরিবেশ, কারখানা, কর্মচারী, জনবসতির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা অবাস্তব বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে ফুটোওলা পাইপ এবং অনুচ্চ চিমনি নির্গত নানা ক্ষতিকর রাসায়নিক সমন্বিত গ্যাস, কার্বন ডাই সালফাইড প্ল্যাণ্টের উচ্চচাপজনিত হঠাৎ-ছাড়া অতিদাহ্য গ্যাস, যেখানে সেখানে ইচ্ছেমত ফেলা বর্জ্যদ্রব্যের স্তূপ, ছোট বড় নানা নালা থেকে বেরিয়ে আসা ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত জল, স্পিনিং সেকশন থেকে উড়ে বেড়ানো কুচো ফাইবার, এবং নানা ছোটখাটো দুর্ঘটনা কারখানা সংলগ্ন ও দূরবর্তী অঞ্চলের মাটি, জল, বায়ুমণ্ডলকে ক্রমাগত দূষিত

করে আপামর মানুষ ও জীবজন্তুর নানা দুরারোগ্য অসুখের সৃষ্টি করে চলেছে। ধীরে ধীরে মৃত্যুও ঘটাচ্ছে বহু মানুষের।

সবচেয়ে দুঃসময় হ'ল বর্ষাকাল। ঐ সময় জলীয় বাষ্পপূর্ণ গুমোট ভারী বায়ুর স্তর ক্ষতিকর গ্যাস সমেত মাটির খুব কাছাকাছি নেমে এসে পরিস্থিতি অসহনীয় করে তোলে। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। রক্তবমি সমেত হাজারো অসুস্থতার সৃষ্টি হয়, স্কুল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় স্কুল পরিচালকরা, মাঠের পর মাঠে ফসল নষ্ট হয়, পুকুরে মাছ মরে ভেসে ওঠে, টিউবওয়েল, কুয়োর জল পানের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

গ্যাসের প্রভাব ঃ ভুক্তভোগীদের মুখে

শ্রীমতী মীরা চক্রবর্তী, রঘুনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, বললেন, গ্যাসে অতিষ্ঠ হয়ে স্কুল ছুটি দিতে বাধ্য হন প্রায়শই। কোন কোন বাচ্চা বমি করতে থাকে, অজ্ঞান হয়ে যায়, অনবরত কাশতে থাকে। দম বন্ধ করা কাশি। গ্যাস চোখে লাগার দুতিন দিনের মধ্যে চোখ লাল হয়ে যায়, জল কাটে, ফুলে ওঠে।

ই.এস.আই. হাসপাতালের ডাক্তার মাণিক ভট্টাচার্য। বয়স প্রায় সত্তর। বললেন ঃ এই গ্যাস থেকেই কোশোরাম কারখানা সংলগ্ন গ্রামের অধিকাংশ মানুষ হাঁপানি, টি. বি., ক্রনিক ব্রংকাইটিসের শিকার হন। এছাড়াও ক্ষুধামান্দ্য সহ বিবিধ ধরনের পেটের রোগ হামেশাই দেখা যায়। এই কারখানার অধিকাংশ কর্মচারী, তাঁর মতে, কমবয়সেই কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে অকালবার্ধক্যের শিকার হন। তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় আশপাশের বাচ্চা ছেলেমেয়েদের।

কেশোরাম কারখানার কর্মচারী শ্রী লক্ষ্মী পণ্ডিত। চোখে গ্যাস লাগায় বেশ কিছুদিনের জন্য চোখে কিছু দেখতে পেতেন না, বহু চিকিৎসার পর এখন কিছটা সুস্থ, তবে স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে।

রঘুনাথপুরের বাসিন্দা মল্লিকা সিং। ঐ কারখানার কার্বন ডাই-সালফাইড প্ল্যান্টের কর্মী। 1974 সালে কারখানার মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েন, হাসপাতালে ভর্ত্তি হন। কয়েকদিনের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

মাঙ্গিলাল, বয়স আটত্রিশ। 1983র 15 মার্চ হঠাৎ টলতে টলতে হাজির হলেন স্থানীয় জনসেবা হাসপাতালে। কর্মরতা নার্সের মনে হল মদোন্মত্ত। কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষায় ধরা পড়ল আসলে রোগটা হেমিপ্লেজিয়া (আংশিক অসারত্ব)। তাঁর বাঁ দিকটা সম্পূর্ণ অসার হয়ে গেছে, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। ইনিও রেয়ন কারখানার কর্মী—তবে কুন্তিবাটের নয়, নাগদার। শুধু মঙ্গিলাল নয়, দুঙ্গার সিং, আবদুল আজিজ, গয়ান সিং সহ নাগদার রেয়ন কারখানার বহু কর্মীই আজ হেমিপ্লেজিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মুখ, হাত, পা, সহ বিভিন্ন অঙ্গের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারিয়েছেন। ঐ কারখানার হরিলাল, মোহনলাল সোনি আজ দুরারোগ্য হৃদ্‌পিণ্ডের অসুখে আক্রান্ত।

শ্রী লক্ষণ সাধুখাঁ, বয়স চল্লিশ, রঘুনাথপুরেই থাকেন। তাঁর নতুন বাড়ীর জানলার শিক, পাল্লার রঙ গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে চটে গেছে। পেতল কাঁসার ঘটি, বাটি, বালতি, গ্লাস, ঘড়া সবেতেই কালো কালো ছোপ। তিনি নিজেও গ্যাসে আক্রান্ত। মাঝে মাঝেই রক্তবমি হয়। ইনি এই কারখানারই ইলেকট্রিক্যাল সেকশনের কর্মী।

শ্রী সুবল চন্দ্র ঘোষ। নয়াসরাই, লক্ষ্মীবাজারে মিষ্টির দোকান, ঐ দোকানের ওপরেই তাঁর বাড়ী। একেবারে কারখানার ধার ঘেঁষে। তিনি জানালেন, সি এস-টু প্ল্যান্টের গ্যাসে মাঝে মধ্যেই তাঁর বাড়ী সহ আশপাশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বাড়ীতে টেকা কষ্টকর হয়ে ওঠে। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, চোখ জ্বলে। সিমেন্টে চিড় ধরে। গাছপালাও ঝলসে পুড়ে গেছে। এই গ্যাস যে কোন সময়ই, বিশেষ করে সন্ধ্যের পর রাতে, ছাড়া হয়ে থাকে। 1969-এর মার্চে প্ল্যান্টের মধ্যে এক বিস্ফোরণে চারজন মারা যায়। ঘটনাস্থলেই তিনজন, একজন পরে হাসপাতালে।

শ্রী পুলিন দাসের পুকুর নয়াসরাইতে, কারখানার ধার ঘেঁষে। প্রায় দশ বছর বন্ধ্যা হয়ে গেছে এসিডে সংপৃক্ত হয়ে। মাছ ত' দূরের কথা, পুকুরের জলের সংস্পর্শে আশপাশের ঘাস, গাছপালাও পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে।

শুধু রঘুনাথপুর নয়াসরাই নয়, শেরপুর, রামনগর, বিশপাড়া, গোপালপুর, মধুসূদনপুর, মালিরবেড়, নারিচা সহ কারখানার আশপাশের প্রায় দুই মাইল ব্যাপী এলাকা ভীষণভাবে দূষিত, ক্ষতিগ্রস্ত। এই অঞ্চলের প্রধান ফসল ধান। আর ক্ষতিও হয় সবচেয়ে বেশী সেই ধানেরই। শিবু সাঁতরা, নিজে চাষ করেন। জানালেন, রামনগরের জমিতে আগে বিঘেপিছু আঠারো কুড়ি মণ ধান ফলতো, এখন হাজার চেষ্টাতেও আট দশ মণের বেশী ফলানো যায় না। এই অঞ্চলের অন্যান্য ফসল পাট, আলু, কপি, পেঁয়াজ, লঙ্কা, কুমড়ো। সবই গ্যাসে আবর্জনায় আক্রান্ত, ক্ষতিগ্রস্ত। পাতা ঝরে যায়, পুড়ে যায়। আম, জাম, লিচু গাছে ফল দূরের কথা, গাছের বৃদ্ধিই বন্ধ হয়ে গেছে। নতুন গাছ বসিয়ে বাঁচানো যায় না। কিছুদিন টিকে থেকেই মরে যাচ্ছে। রামচন্দ্র মালি, রিচপাল সিং, অরবিন্দ নায়ার, টি. কে. কান্নন যখন নাগদার গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে হৃদ্‌যন্ত্রের কষ্টে সেখানকার হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছিল ঠিক সেই সময়েই কলকাতার শেঠ শুকলাল কারনানী হাসপাতালে কেশোরাম রেয়নের কর্মী সুশীল প্রামাণিক, নিমাই পণ্ডিতও কারখানার দূষণে আক্রান্ত হয়ে যন্ত্রণাময় মৃত্যুর হাতে নিজেদের সঁপে দিতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য কারখানা কর্তৃপক্ষের দয়ায় ওদের দুজনের স্ত্রীই এখন ঐ কেশোরামেরই কর্মী। 1983র জানুয়ারী মাসে মারা গেলো আরো দু'জন—সওদাগর প্রসাদ এবং কমলা মহারাজ।

কারখানার বর্জ্যদ্রব্য মিশ্রিত ময়লা জলের সবকটি নালাই রোজ নানান বিষাক্ত পরিত্যাজ্য এনে ফেলছে গঙ্গায়। যে নালাগুলো লোকের

চোখে পড়ে সেগুলোতে ইদানীং শোধনের ব্যবস্থা হয়েছে। ঠিকাদারের লোক চুণের ব্যাগ নিয়ে নালার ধারে বসে থাকে। মাঝে মধ্যে মুঠোভরা চুণ ড্রেনের জলে ছুঁড়ে ছড়িয়ে দেয়। সবকটি নালার জন্য সারাদিনে বরাদ্দ মোট আঠারো বস্তা চুণ।

কারখানার শুকনো, অদ্রাব্য বর্জ্যদ্রব্যগুলো যায় কোথায়? কেন, পাশেই ক্ষেতের জমিতে, রেললাইনের ধারে, জমির মালিকের অনুমতি ছাড়াই জোর করে ফেলা হয়। মাঝে মাঝে রফাও হয়। যুগলচন্দ্র মাঝির তিন বিঘে জমি কারখানার কর্তৃপক্ষ কিনেছে মাত্র আট হাজার টাকায়। আবর্জনা ফেলছে। কোনও পাঁচিলও দেয় নি। আবর্জনার স্তূপ জমতে জমতে আশপাশের জমিতেও ছড়িয়ে পড়ছে। এক একটি বর্ষা যাচ্ছে, আর ঐ আবর্জনা ধোয়া জল কাছের ফসলী জমিকেও বন্ধ্যা করে দিচ্ছে।

উনিশ শ' ষাট সালে শিল্প মন্ত্রী, জেলাশাসক, জেলা কৃষি অধিকারিক সকলকেই সব বিষয় জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছিল স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষ থেকে। রজ্যের চিফ্ ইনস্পেক্টর অভ্ ফ্যাক্টরীজ ঐ কারখানা পরিদর্শনও করে গেছিলেন।

1965তে কুন্তিঘাটের সাধারণ মানুষ কে. সি. ভট্টাচার্য, কে. ডি. রায়ের নেতৃত্বে কেশোরাম রেয়ন গ্যাস রেজিস্টেন্স কমিটি গঠন করে। তারা নানাভাবে কর্তৃপক্ষকে দূষণের ব্যাপারটা জানাবার চেষ্টা করেছে, প্রতিকারের ব্যবস্থা দাবী করেছে। তবে ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ তথা আন্দোলনকারীরা কখনই এই কারখানা বন্ধ হয়ে যাক, তা কিন্তু চায় নি। এখনো চায় না। 1967-তে আদালতে মামলা রুজু করা হয়। অবশ্য কোনরকম হিয়ারিং ছাড়াই কোন এক অজ্ঞাত হাতের খেলায় সে কেস্ ডিস্মিস্ হয়ে যায়। একটু উগ্র ধরনের আন্দোলনও কখনো কখনো হয়েছে। 1967তে গ্যাস কমিটির চাপে কর্তৃপক্ষ তিন মাস প্ল্যান্ট বন্ধ রাখতেও বাধ্য হয়েছিল। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা পতনের পর 1971 থেকে যথারীতি গ্যাস কমিটিকে আর পাত্তা দেওয়া হয়নি। এই কিছুদিন আগে (1984) পরিবেশ মন্ত্রী ভবানী মুখার্জী সহ বেশ কয়েকজন হোমড়া চোমড়া ব্যক্তিও এসব দেখেশুনে গেছেন। কিন্তু কিছু কাজ হয়নি। কারখানা কর্তৃপক্ষ দূষণ রোধের ব্যাপারে যথারীতি উদাসীন।

নানান অভিযোগ এবং আন্দোলনের চাপে পড়ে কর্তৃপক্ষ মাঝেমধ্যে কিছু কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। চন্দ্রাহাটী গ্রামপঞ্চায়েতের গ্রামপ্রধানকে একটা চিঠি দিয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, এই দূষণের ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা করে একটি বিশেষ 'সেল' গঠন করা হয়েছে। এর কাজ হবে দূষণ প্রতিরোধে যথাসম্ভব দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া। কিন্তু 'আশ্বাস' আশ্বাস-ই থেকে গেছে, কাজ প্রায় কিছুই এগোয় নি। তবে স্থানীয় লোকেদের চেঁচামেচি, আন্দোলন কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু স্থানীয় লোককে চাকুরীও দেওয়া হয়, আর, নানা সংস্থা উন্নয়নের নামে কিছু কিছু টাকা অনুদান হিসাবেও পেয়ে থাকে।

চাকুরী, অনুদান, ছাড়াও আছে ভয় দেখানোর ব্যবস্থা—আন্দোলনকারীদের ওপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টির চেষ্টা। যেমন, কিছুদিন আগেই রঘুনাথপুরের বাসিন্দা, পল্লী উন্নয়ন সমিতির সদস্য নিমাই মণ্ডলকে কিছু লোক ভয় দেখিয়ে গিয়েছে। দূষণ নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করতে বারণ করে গেছে স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে। সব দেখে মনে হয়, রেয়ন কর্তৃপক্ষ দূষণ নিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণের চেয়ে অনেক বেশী তৎপর নানাভাবে স্থানীয় আন্দোলন নিয়ন্ত্রণের উপায় উদ্ভাবনে।

পুরনো গ্যাস কমিটি ভেঙে গেছে—1960 সালে যারা সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে ছিলেন আজ তাঁরা অনেকেই নেই। বয়সের ভারে, পারিবারিক অবস্থার চাপে, কেউবা হতাশায়, আন্দোলনবিমুখ হয়ে পড়েছেন। অবশ্য নতুন করে আবার আন্দোলন গড়ে উঠছে। এখন আর কোন কমিটি নেই। তবে যখনই অতিরিক্ত গ্যাস ছাড়া হয়, তখনই বাচ্চা বুড়ো ছেলে মেয়ে পিল্ পিল্ করে কারখানার গেটে গিয়ে ধর্না দেয়। কর্তৃপক্ষ বিপদ বুঝলে কখনো কখনো গ্যাস ছাড়া বন্ধও করে দেয়। বহু নতুন মুখ, বহু বিজ্ঞান ক্লাব, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, পত্রিকাগোষ্ঠী দূষণ বিরোধী আন্দোলনে আগ্রহ দেখাচ্ছে।

আবার একই সময় বিড়লার স্মৃতি অক্ষয় করতে ফ্যাক্টরী সংলগ্ন মন্দিরের সবুজ অঙ্গিনায় বসেছে জি. ডি. বিড়লার আবক্ষ মূর্তি। □

ভূপালের "গণহাসপাতাল" আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থী
চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী বা ভলেণ্টিয়ার হিসেবে এগিয়ে আসুন
অর্থ সাহায্য পাঠান
যোগাযোগ ঃ ড্রাগ ফোরাম/উৎস মানুষ/লোকবিজ্ঞান/প্রগতিবার্তা/বি-ও-বি

বায়োটেকনলজি—এদেশে

গৌতম ব্যানার্জি

বায়োটেকনলজি আজকের দিনে একটি সফিস্টিকেটেড প্রযুক্তি। পাশ্চাত্যে এর ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছে। এদেশেও উপর মহল থেকে এর চর্চা এবং প্রয়োগের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন এড়িয়ে গেলে চলবে না।

পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে অন্যান্য প্রযুক্তিবিদ্যার মতো বায়োটেকনলজিও এক যুগান্তকারী সম্ভাবনার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তার উত্তাপ উন্নতিকামী দেশগুলিতেও এসে পড়ছে। এই সন্ধিক্ষণে বায়োটেকনলজি সংক্রান্ত নানান প্রশ্ন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা দরকার। যে কোন সফিস্টিকেটেড প্রযুক্তিবিদ্যার মতোই বায়োটেকনলজিও সমাজের এলিট শ্রেণীর কুক্ষিগত বিশেষ মর্যাদা-প্রাপ্ত একটি কার্যকলাপে পরিণত হতে পারে, বিশেষ করে উন্নতিশীল দেশে। উন্নত দেশের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বায়োটেকনলজির নতুন আবিষ্কারগুলো নিজস্ব স্থান করে নিতে পারছে। কিন্তু অনুন্নত বা উন্নতিশীল দেশের নড়বড়ে কাঠামোয় (যেখানে সাবেকী প্রযুক্তিই সর্বস্তরে যথেষ্টভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি) বায়োটেকনলজি নিয়ে বর্তমান উদ্দীপনা কোনো সুফল ফলাবে কি না তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

বায়োটেকনলজি বলতে কি বোঝাতে চাইছি সে সম্পর্কে দু'চার কথা এখানে বলে নেওয়া ভাল। বহুকাল ধরে আমরা পরিচিত আছি প্রচলিত কিছু প্রযুক্তিবিদ্যার সাথে, যার সাহায্যে জীববিদ্যার কিছু ধ্যান-ধারণাকে সরাসরি কাজে লাগানো হয় সমাজের প্রয়োজনে। যেমন, বিভিন্ন রোগের টিকা, ফারমেন্টেশানের সাহায্যে এলকোহল, এন্টিবায়োটিক জাতীয় দ্রব্য, কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা হৃদযন্ত্র, উন্নত জাতের ফসল, ফল, ইত্যাদি বানানো। যে সব সাবেকী পদ্ধতিতে এইসব কাজ করা হতো সেগুলির ক্ষমতা সীমিত। অনেক জটিল সমস্যার সমাধান তাতে সম্ভব ছিল না। গত কয়েক দশকে জৈব রাসায়নিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কার বর্তমান বায়োটেকনলজির কার্যকরী ক্ষমতা অনেক বাড়িয়েছে এবং প্রয়োগক্ষেত্রের প্রসার ঘটিয়েছে। ফলশ্রুতিস্বরূপ নতুন যে সব প্রযুক্তি যোগ হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জিন ক্লোনিং, মনোক্লোনাল এন্টিবডি তৈরী করা, জিনের নির্দিষ্ট জায়গায় ইচ্ছামত মিউটেশন ঘটানো, জিনে নিউক্লিওটাইডের পরম্পরা ও বিন্যাস নির্ণয় করা, জিবকোষের ফিউশন, নতুন প্রক্রিয়ায় টিস্যু কালচার, ইত্যাদি। এর ফলে শুধু যে জেনেটিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে তাই নয়, সেই সাথে প্রজাতির ব্যবধান অতিক্রম করে পরিকল্পনামাফিক জেনেটিক পরিবর্তনও ঘটানো যাচ্ছে। সায়েন্স ফিকশানে বর্ণিত অনেক ঘটনাবলীই ভবিষ্যতে ঘটতে দেখা যাবে। এই ধরনের প্রযুক্তি শুধু বস্তুগত অবস্থারই পরিবর্তন ঘটায় না জীবন ও প্রকৃতির স্বাভাবিক কার্যাবলীতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার সুযোগ এনে দেয়। বলা বাহুল্য, এতে অনেক নীতিগত প্রশ্ন উঠতে বাধ্য যা নিয়ে বি-ও-বি তে আগে আলোচনা হয়েছে।

বায়োটেকনলজির বর্তমান পর্যায় কি রকম সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে তা দু'য়েকটা উদাহরণ দিয়ে তুলে ধরা যেতে পারে যা আমাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হবে।

(ক) কৃষিক্ষেত্রে নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক সার ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক। অথচ তাতে যেমন বাড়তি ব্যয় বহন করতে হয় তেমনি অত্যধিক রাসায়নিক সার ব্যবহার ক্রমশ জমির ক্ষতি করতে পারে। বিজ্ঞানীরা ভাবছেন যে ধান বা গমের ক্রমোজমে বিশেষ ধরনের ব্যাকটেরিয়া বা এলগীর ক্রমোজম থেকে আলাদা করে আনা জিন নতুন ভাবে সংযোজন করা সম্ভব যার সাহায্যে ধান বা গমের চারা বাতাসের নাইট্রোজেনকে সার হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে। এই ধরনের গবেষণা সফল হলে উন্নতিশীল দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলবে। (খ) ব্যাকটেরিয়া বা প্রটোজোয়া ধরনের জীবাণুর আক্রমণে ট্রপিকাল অঞ্চলের দেশ তথা তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ শৈশব অবস্থা থেকে কোন না কোন রকম মারাত্মক প্রাণঘাতী রোগে ভোগে। এইসব অধিকাংশ রোগের বিরুদ্ধে কার্যকরী এবং সস্তায় লভ্য কোন ঔষধ প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নি। বর্তমানে ঐ সব জীবাণুর ক্রমোজম থেকে বিশেষ ধরনের এন্টিজেনের জিন আলাদা করে এনে যথেষ্ট পরিমাণ এন্টিজেন তৈরী করে তার বিরুদ্ধে এন্টিবডি তৈরী করা সম্ভব বলে ভাবা হচ্ছে। এর ফলে প্রতিষেধক টিকা প্রস্তুত করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। সফল হলে তৃতীয় বিশ্বের সমাজে এই ধরনের প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রভাব পড়ার কথা।

উদাহরণের সংখ্যা না বাড়িয়ে বলা যায় যে বায়োটেকনলজির মহৎ সম্ভাবনা আছে, যদি সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা এই প্রযুক্তিকে সমাজের সর্বস্তরে প্রয়োগ করার মতো অবস্থায় থাকে। শুধু মুনাফার অভিলাষী এমন সমাজে বায়োটেকনলজি মুনাফা লাভের আরও একটা নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে মাত্র। এ সব নিয়ে এখানে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু অন্ততঃ উল্লেখ করা দরকার যে উন্নতিশীল দেশগুলির ভেবে দেখা প্রয়োজন, বর্তমান বায়োটেকনলজি সংক্রান্ত জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করার জন্য তারা প্রস্তুত কি না। না কি, স্রেফ হুজুগে পড়ে বা ফ্যাসানের আকর্ষণে অথবা সৌখিন মর্যাদার অভিলাষে তারা বায়োটেকনলজি নিয়ে মাতামাতি করছে।

এই সব প্রশ্ন মনে রেখে ভারতে বায়োটেকনলজির স্থান কোথায় তা ভাবতে গেলে যে প্রসঙ্গগুলো প্রথমেই মনে আসে তা হলোঃ (ক) গত 35 বছরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্যসংস্থানের ক্ষেত্রে দেশের অধিকাংশ

দরিদ্র জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি হয়নি (সবুজ বিপ্লব সত্ত্বেও) বলে আমরা কি চালু প্রযুক্তি ও প্রয়োগপদ্ধতিগুলির উপর আস্থা হারাতে চলেছি, যে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার যাদুতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হচ্ছে? (খ) এখনকার একটা চলতি ভাবনা হলো, সাবেকী প্রয়োগপদ্ধতিগুলি সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। পক্ষান্তরে নতুন নতুন প্রযুক্তি এমন সম্ভাবনা এনে দিয়েছে যে এখন অনেক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সহজে অতিক্রম করা সম্ভব। আমাদের space research programme এবং বর্তমান বায়োটেকনলজি নিয়ে উৎসাহ এই ধরনের চিন্তাধারায় পুষ্ট। স্যাটেলাইট দ্বারা অন্তরীক্ষে যোগাযোগ সৃষ্টি করে চাষীদের জন্য আবহাওয়ার সংবাদ পরিবেষণ করা এবং গ্রামে গ্রামে টি-ভি প্রোগ্রাম পৌঁছে দিয়ে শিক্ষার আলো ছড়াবার চেষ্টা তারই প্রতিফলন। কিন্তু গ্রামে যখন যথেষ্ট প্রাথমিক স্কুল নেই এবং পাঠশালায় ব্ল্যাকবোর্ড, চক, খাতা-পেন্সিল, জলখাবার ও বাথরুমের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সরবরাহ নেই, সেখানে এ ধরনের প্রচেষ্টার সার্থকতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করাই স্বাভাবিক। আসলে সমাজে যে ন্যূনতম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সার্থকভাবে রূপায়ণ করা সম্ভব হয় তাই এখন পর্যন্ত করা হয়ে ওঠেনি। তাই উপরোক্ত প্রচেষ্টাগুলি শুধু উচ্চ ও মধ্যবিত্ত কনজিউমারদের সেবায় নিবেদিত হয়ে থাকবে বলে মনে হয়।

(গ) একই বক্তব্য বায়োটেকনলজির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু এখানে কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন।

(1) যে সব প্রযুক্তি সরকারী সংস্থা মারফত জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় প্রয়োগের জন্য সেখানে প্রশ্ন ওঠে, আপামর জনগণের ঐ ধরনের প্রযুক্তি প্রয়োগ করার মতো সঙ্গতি ও প্রস্তুতি আছে কিনা। কৃষিক্ষেত্রে এই সঙ্গতি ও প্রযুক্তির সংঘাত প্রচুর দৃষ্টান্ত রেখেছে। সবুজ বিপ্লবের প্রয়োজনে উচ্চফলনশীল বীজ সৃষ্টি করে চাষীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি তা হলো পর্যাপ্ত পরিমান সার, কীটনাশক এবং জলসেচ ব্যবস্থা। চাষীদের নিজস্ব সঙ্গতির ব্যবধান (সরকারী অনুদান বা ব্যাঙ্কলোন সত্ত্বেও) দেশের এক এক অঞ্চলের ফসল উৎপন্নের পরিমাণের ব্যবধানের কারণ হয়েছে। তাই সবুজ বিপ্লব সব অঞ্চলে ঘটেনি। তেমনি দুধ বা মাংসের প্রয়োজনে উন্নত জাতের গরু, মোষ, মুরগী ইত্যাদির সৃষ্টি ও প্রতিপালন বা প্রচুর পরিমাণ মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে প্রারম্ভিক খরচ বহন করা প্রয়োজন তা এখন পর্যন্ত সাধারণ চাষীর সঙ্গতির বাইরে। এই সব প্রযুক্তি আয়ত্তে থাকলেও তার সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি। আর, কোন নতুন প্রযুক্তিই সঙ্গতির অভাব দূর করবে না। শিক্ষা এই যে, কোন প্রযুক্তির সার্থক প্রয়োগ অধিকাংশ মানুষের এক ন্যূনতম সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থার উপর নির্ভরশীল। প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলো, এই শর্ত পূরণ করার দায় কি শুধু সরকারের বা ব্যুরোক্রেসীর?

(2) অধিকাংশ দরিদ্র জনগণের ক্যালরী ও প্রোটিনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য মাছ-মাংসের বিকল্প হিসাবে ভাত-ডাল বা ডাল-রুটি ও ভোজ্য তেলের কথা ভাবা হয়। অথচ বাজারে ডাল, সোয়াবীন, বাদাম ইত্যাদির সরবরাহ অপ্রতুল। কারণ হিসাবে বলা হয়ে থাকে যে বাজারে নিশ্চিত ও উপযুক্ত মূল্যের অভাবে চাষীরা ঐ সমস্ত ফসলের জন্য কোন জমি নির্দিষ্ট রেখে চাষাবাদ করতে চান না, বরং ধান, গম, ভুট্টা উৎপাদনের ফাঁকে ফাঁকে রোটেশন ক্রপ (rotation crops) হিসাবে ঐ সব ফসল উৎপন্ন করেন। তাতে প্রারম্ভিক খরচাপাত খুব কম হয়, বাজারে দাম না পেলেও ক্ষতি হয় না। কোন সরকারী সংস্থা ধান, গম, ভুট্টা, আলুর মতো ডাল, সোয়াবীন, বাদাম, বাজার থেকে উপযুক্ত মূল্যে কিনে গুদামে জমা করে না। ফলে ঐসব ফসল উৎপাদনে চাষীদের উৎসাহ বা আস্থা কম। এখন কথা হলো যে, উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রয়োগে উচ্চফলনশীল ডাল, সোয়াবীন বা বাদামের বীজ সৃষ্টি করে চাষীদের কাছে পৌঁছে দিলেও সঠিক কৃষি পদ্ধতি প্রয়োগে অনাগ্রহ এবং বাজারে উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা দূর করতে না পারলে প্রযুক্তির সার্থক প্রয়োগ কখনই সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব নেই, অভাব উপযুক্ত বাজারমূল্যের।

(3) অন্যদিকে এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে সরকারকে শুধু প্রযুক্তির উন্নতিসাধন ও সরবরাহ করলেই চলে না, প্রয়োগ করার দায়ও বহন করতে হয়। সে সব ক্ষেত্রে বায়োটেকনলজি সংক্রান্ত গবেষণা প্রয়োজন, এবং বলা যায় অপরিহার্য। সরকারের কথাই বলা হলো, কেন না পাশ্চাত্ত্য দেশের বিপরীতে ভারতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গবেষণার দায়-দায়িত্ব এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে সরকারের উপরই বর্তায়। প্রাথমিক হেল্‌থ কেয়ার ব্যবস্থায় বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ ও সেনিটেশানের সাথে সাথে বিভিন্ন রোগের কার্যকরী টিকা সৃষ্টি ও উৎপাদন করতে হলে বা প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয়ের উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হলে বায়োটেকনলজি নিয়ে নতুন নতুন গবেষণার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে ভারত তথা উন্নতিশীল দেশের হেল্‌থ কেয়ার ব্যবস্থার যে সব সমস্যা রয়েছে তার অনেকগুলি এতই স্থানীয় ধরনের যে পাশ্চাত্য দেশের গবেষণায় সে সব বিষয়ের গুরুত্ব কম। তেমনিভাবে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত বেশ কিছু কৃষি ফসল নিয়ে গবেষণা প্রয়োজন যাতে উচ্চ ফলনশীল বীজের জল ও সারের প্রয়োজন কমে এবং কীটরোধ ক্ষমতা বাড়ে। এসব ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ধ্যানধারণার প্রয়োগ যথেষ্ট কার্যকরী হতে পারে।

ভারত সরকার National Biotechnology Board তৈরী করেছেন এবং দেশ-বিদেশের বহু বিজ্ঞানীকে তাতে জড়িয়েছেন এই সব সমস্যা নিয়ে ভাবার জন্য এবং কার্যকরী পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য। গত 35 বছরেও যে সকল প্রাথমিক কিন্তু একান্তভাবে আবশ্যিক সমস্যাগুলির সুরাহা করা যায় নি সেগুলির মোকাবিলায় সরকার ও জনগণের আরও কঠিন প্রচেষ্টায় লাগা দরকার। কোন রকম চটকদারী দাওয়াই যেন আমাদের বিভ্রান্ত না করে। ভারতীয় বিজ্ঞানী সমাজ ও সরকার পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করবেন, আমরা এই আশাই করবো। □

জনৈক বিজ্ঞানীর অন্তিম নিবেদন

বৈজ্ঞানিক জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মনে হচ্ছে 1966 সালের পর থেকে ক্ষেতখামারে কাজ করলেই ভাল করতাম...

[নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানী মার্টিন রাইল এই চিঠিটি লিখেছিলেন পণ্টিফিকেশান একাডেমী অভ সায়েন্সের সভাপতি কার্লো চাগাসকে। চিঠিটি 1984 সালের 14 ফেব্রুয়ারী 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকায় এবং পরবর্ত্তীকালে মে, 1985 সংখ্যার 'সায়েন্স এজ' পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়। চিঠিটির সংগ্রাহক এস. রামসেসন।

বিজ্ঞান গবেষণার ব্যাপক অপব্যবহারের বিরুদ্ধে, পৃথিবীব্যাপী নিউক্লিয়ার যুদ্ধের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে, শান্তির স্বপক্ষে, বিজ্ঞান-গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গজদন্তমনার ছেড়ে মার্টিন রাইলকে দেখা গেছে নিউক্লিয়ার বিরোধী, দূষণবিরোধী মিছিলের পুরোভাগে। আজকে সারা দুনিয়া জুড়ে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীরা যেখানে এক চরম সংকটের মুখোমুখি সেই সময় এই নিবেদনটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, মার্টিন রাইল মারা যান এই চিঠিটি লেখার এক বছর পর, 14 অক্টোবর, 1984 তারিখে।]

24শে ফেব্রুয়ারী, 1983

প্রিয় অধ্যাপক চাগাস,

শান্তির স্বপক্ষে বিজ্ঞানীদের অবদান কি হওয়া উচিত এ হেন এক দুরূহ বিষয়ে মন্তব্য করতে বলে আমাকে বেশ বিব্রত করেছেন।

এখানে আমি একান্ত ব্যক্তিগত কিছু মতামত প্রকাশ করছি, যা হয়ত সমস্যাটায় আলোকপাত করতে পারে। বিজ্ঞানকে রাজনীতি-সমরনীতি-ইতিহাস বহির্ভূত এক বিষয় হিসেবে আর ভাবা যায় না বলেই আমি মনে করি। হয়ত আমি একজন বৃটিশ নাগরিকের চোখেই সমস্যাটি দেখছি, কিন্তু একজন ইউরোপীয় নাগরিক হলেও একই ভাবে দেখতাম।

রাজনৈতিক ঃ সোভিয়েত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বাস্তব—হয় তারা একসঙ্গে বাঁচবে না হ'লে তারা একই সঙ্গে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিরপরাধ নাগরিক প্রাণ হারিয়েছিলেন শতকরা পাঁচজন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শতকরা পঞ্চাশ জন, আর নিউক্লিও যুদ্ধে প্রাণ হারাবেন শতকরা পচানব্বুই জন।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এক অসহনীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিরাজ করছে। যাঁদের এই ব্যবস্থাকে এতটুকু প্রভাবিত করার ক্ষমতা নেই অথচ যাঁরা ভুক্তভোগী তাদেরই এই ব্যবস্থার শিকার হতে হবে।

বাইরে থেকে কেউ সোভিয়েতের সমরব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে পারবে না। ক্ষতিগ্রস্ত হবে কেবলমাত্র নিরপরাধ নাগরিকেরা। পরিবর্তন আসবে ভিতর থেকেই, অতি ধীরে।

পশ্চিমী দুনিয়াও চলেছে ভ্রান্ত পথে। ধনী-দরিদ্রের ক্রমবর্ধমান ফারাক, বহুজাতিক সংস্থাগুলোর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা, ভিয়েতনাম, চিলি ও মধ্য আমেরিকায় ভারসাম্য বিনষ্ট করার চেষ্টা, আর তৃতীয় দুনিয়ার সঙ্গে অপ্রতুল সহযোগিতাই প্রমাণ করে পশ্চিমী দুনিয়া কোন পথে।

রাশিয়ার সমরসামগ্রী পাশ্চাত্য দুনিয়ার সাথে পাল্লা দিতে পারলেও, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দুই বৃহৎ শক্তির দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সমর বাহিনীর 70 লক্ষ লোক ও 1 কোটি 20 লক্ষ নাগরিক প্রাণ হারায়। তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরবাহিনীর খুব কম লোকই প্রাণ হারায়। কোন মার্কিন নাগরিক এই যুদ্ধে প্রাণ হারান নি। আবার, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের যেখানে 20 লক্ষ বর্গকিলোমিটার ক্ষতিগ্রস্ত ও অধিগৃহীত হয় সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানচিত্র অক্ষুণ্ণ থাকে।

এই দুই দেশের উপর যুদ্ধের প্রভাব উপরিউক্ত পটভূমিতেই বিচার করতে হবে।

ইউরোপবাসীদের অভিজ্ঞতা এই দুই চরম বিন্দুর মাঝামাঝি অবস্থান করে বলেই এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ বিশেষভাবে অনুধাবন করা দরকার।

মানবিক ঃ বর্তমানে নিউক্লিও অস্ত্রসম্ভার এত বিশাল যে তার এক ক্ষুদ্রাংশ ব্যবহৃত হলেও গোটা উত্তর গোলার্ধের সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে "ক্ষমতার সাম্য" ও "শক্তি বজায় রেখে বোঝা পড়ার" নীতি অর্থহীন। কোন রকম মানবিক ঝুঁকি ছাড়াই পূর্ব অথবা পশ্চিমের দশ, বিশ অথবা পঞ্চাশ শতাংশ সমরাস্ত্র বিনষ্ট করা যায়।

তবুও পেনটাগনের লক্ষ্য হ'ল তৃতীয় প্রজন্মের অস্ত্র তৈরি করা, আর ব্রেজনেভের সাম্প্রতিক উক্তি অনুযায়ী সোভিয়েতের লক্ষ্য হ'ল প্রতিটি ক্ষেত্রে মার্কিন সমরাস্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া।

নিউক্লিয়ার মানচিত্রের প্রসার ঃ নিউক্লিও দেশগুলি "গবেষণা" ও "শক্তির" নামে অনিউক্লিও দেশগুলিতে বিশুদ্ধ প্লুটোনিয়াম চালান

করার এক সম্মানজনক রাজনৈতিক রাস্তা তৈরি করেছে। নিউক্লিও ও নিকট-নিউক্লিও দেশসমূহ এইভাবেই অনিউক্লিও দেশগুলিকে শোষণ করে চলেছে। তৃতীয় দুনিয়ার বেশিরভাগ নিউক্লিও শক্তি সম্পন্ন দেশ কিন্তু তাদের শক্তির চাহিদা মেটাতে পারে না।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ইংল্যান্ডে শতকরা চল্লিশজন কারিগরিবিদ ও তার চেয়ে কিছু বেশি অনুপাতে পদার্থবিদ নতুন নতুন মারণাস্ত্র তৈরি করার কাজে নিযুক্ত আছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও যুদ্ধবাজ বিজ্ঞানীদের সংখ্যা কম নয়। বিজ্ঞানীদের জন্য কিছু কাজের রাস্তা থাকলেও সামাজিক অর্থবহ কাজ পাওয়া দুষ্কর। এ ব্যাপারে যখন কোন তরুণ বিজ্ঞানী আমার কাছে পরামর্শ চাইতে আসে আমি উত্তর দিতে পারি না।

অবশ্যই এর জন্য সরকারকে দায়ী করা যায়, কারণ ব্যয়ের অগ্রাধিকারের প্রশ্নে ক্ষমতাশালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর চাপে সরকার নতি স্বীকার করে। কিন্তু এটাই পুরো সত্য নয়। অতি-আধুনিক গবেষণা, অতি-উন্নত কারিগরি, ঢালাও টাকা মঞ্জুর, তরুণ গবেষকদের এই দিকে প্রলুব্ধ করছে। এই গবেষণা এখন শুধু নিউক্লিও অস্ত্রেই সীমিত নয়। ট্যাংক, বোমারু বিমান, রকেট ক্ষেপণাস্ত্র এবং অন্যান্য অস্ত্রসমূহের গবেষণা ও চর্চার ফলে 1945 সাল থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় একশ তিরিশটি যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সমর বাণিজ্য নিষিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত সমরাস্ত্রের ব্যবসায়ে মুনাফার পাহাড় গড়ে উঠেছে, উঠবে। এন্টি-এয়ারক্রাফট্ মিসাইলের পরিণতির কথা না ভেবেই তরুণ বিজ্ঞানীরা এই কাজে অগ্রসর হ'য়ে থাকেন। এরা কোনদিন সমর বিমান গুলি ক'রে নামাতে দেখেনি, এদের সাথে শত্রু বা মিত্রপক্ষের বৈমানিকদের কোন সম্পর্ক নেই। বেশিরভাগ তরুণ বিজ্ঞানীই এগুলিকে শুধু চমকপ্রদ সমস্যা হিসেবে দেখেন, নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধের সেখানে কোন স্থান নেই। শেষ পর্যন্ত রাজনীতিবিদদেরই হাতে থাকে দিশা নির্ধারণের ক্ষমতা।

বিশ্ববিদ্যালয়ঃ যেহেতু প্রতিরক্ষা দপ্তর বেশি আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকে সেইজন্য বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগ প্রতিরক্ষা দপ্তরের সঙ্গে চুক্তিতেই বেশি করে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

এই বিষয়টি আমাদের কাছে আজ যে প্রশ্ন তুলে ধরেছে তা হ'ল, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিরপেক্ষ গবেষণা প্রতিষ্ঠান হবে, না রাষ্ট্রের সস্তায় কেনা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে? ইংল্যান্ডে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী নিরপেক্ষ কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে এলেও আজ তা দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে।

ব্যক্তি-বিজ্ঞানীঃ নিজের গবেষণা কেন্দ্রের বাইরেও একজন বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ববোধ আছে। চারপাশে যা ঘটছে তা যদি সর্বনাশের ইঙ্গিত হয় তা হলে সে সম্পর্কে মতামত দেওয়ার অধিকার ব্যক্তি বিজ্ঞানীর আছে বলে আমি মনে করি। আমার সাথে একমত হয়েও হয়ত অনেকেই তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করবেন না, টাইমস পত্রিকায় স্বাক্ষরিত মতামতের ক্ষেত্রে যা দেখা গেল। শুধু কেম্ব্রিজের বিজ্ঞানীরাই যে এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন তা আমি মনে করি না।

বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না বর[illegible] অনেকের মত তাঁরাও বিশ্বাস করেন, বিশেষজ্ঞরাই সবচেয়ে বেশি জানে।

মৌলিক গবেষণাঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার বেশির ভাগ[illegible] এখনও প্রাকৃতিক দুনিয়ার জ্ঞান সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। কি ভাবে এই গবেষণার অপব্যবহার হবে তা কি কেউ চিন্তা করতে পেরেছিল (রাদারফোর্ডের আলফা কণার পরীক্ষার কথা ভাবুন)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মন স্থির করেছিলাম যে আমার গবেষণার ফলাফল আর যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হতে দেব না। জ্যোতির্বিজ্ঞান তখন সমরকৌশলের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করত।

কয়েক বছর পর আমরা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন রেডিও টেলিস্কোপ তৈরি করতে সক্ষম হই। পরবর্তীকালে এটাই রাডার ও সোনার ব্যবস্থায় অপব্যবহৃত হয়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হ'ল যে পি. এইচ. ডি ছাত্রদের একটা বড় অংশ তাদের দক্ষতাকে সমর বিজ্ঞানের কাজে লাগাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মনে হচ্ছে 1966 সালের পর থেকে ক্ষেতখামারে কাজ করলেই ভাল করতাম। একথা নিশ্চয় সত্য যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই গবেষণা অন্য কেউ করতেন।

আমরা আবার একটি মৌলিক প্রশ্নের সামনে হাজির হচ্ছি। মৌলিক বিজ্ঞানের গবেষণা কি বন্ধ করে দেওয়া উচিৎ?

এখন মনে হচ্ছে, কয়েকটি ক্ষেত্রে ভালর থেকে মন্দই হচ্ছে বেশী। সার্নের (CERN) ব্যয়বহুল যন্ত্রে নক্ষত্রের বিবর্তন বা পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্র কণার বিষয়ে জানার কি সত্যিই খুব দরকার আছে?

চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণার সুফল বিতর্কাতীত, কিন্তু জেনেটিক ও ভ্রূণ-কৌশলের সম্ভাব্য ভয়াবহতাও কম নয়। আমরা হৃদ্‌যন্ত্র প্রতিস্থাপনের কৌশল আবিষ্কার করেছি কিন্তু অর্ধাহারে, অনাহারে, অপুষ্টিজনিত কারণে যে দেড় কোটি মানুষ প্রতি বছর প্রাণ হারাচ্ছে তার জন্য কতটুকু করেছি।

আমরা অসম্ভব চালাক হয়েছি, অথচ আমাদের প্রজ্ঞা প্রসারিত হয় নি। ☐

ভূপালের 'গণহাসপাতাল'— এর উপর পুলিশী হামলার প্রতিবাদ করি।

বিকল্প নোবেল বক্তৃতা

মাইক কুলী

তরোয়াল থেকে কাস্তেঃ লিউকাস এয়ারোস্পেসের অভিজ্ঞতা

(মাইক কুলী একজন বিশিষ্ট বৃটিশ ইঞ্জিনীয়ার। এঁকে "লিউকাস এয়ারোস্পেস কর্পোরেশন" থেকে বরখাস্ত করা হয় এই কারণে যে তিনি এমন সব বিষয় নিয়ে কোম্পানীতে "কাজকর্ম করেছিলেন যা মূলতঃ সমগ্র সমাজের স্বার্থ সম্পর্কিত"। আর ঠিক সেই সব কাজকর্মের জন্যই তাঁকে 1981 সালের "রাইট লাইভলিহুড ফাউণ্ডেশন" বা "বিকল্প নোবেল পুরস্কার" দিয়ে সম্মানিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন সেই টীমটির নেতা যারা "লিউকাস বিকল্প যৌথ পরিকল্পনা" রচনা করেন। ধ্বংস ও সামরিক কাজের জন্য দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের বদলে লিউকাসের বিভিন্ন ফ্যাক্টরীর বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের নানা স্তরের কর্মীরা যৌথ প্রচেষ্টার সাহায্যে সাধারণ মানুষ ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকরী প্রায় 150টি দ্রব্যসামগ্রী তৈরীর পরিকল্পনা করেন। 1981, 9ই ডিসেম্বর সুইডেনের স্টকহোমে বিকল্প নোবেল প্রাইজ নেওয়ার সময় মাইক কুলী যে ভাষণ দেন তার কিঞ্চিৎ সংক্ষেপিত ভাষ্য নীচে প্রকাশ করা হল।)

আমাদের তথাকথিত উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে প্রযুক্তিবিদ্যা বা টেকনোলজি সমাজের জন্য যে কী করছে, সমাজকে কোথায় নিয়ে চলেছে, তাই আমাকে বিশেষ ভাবিয়ে তুলেছে।

যে সামরিক শিল্পচক্রে (military-industrial complex) আমি প্রায় বিশ বছর কাজ করেছি, সেখানকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা অবিশ্বাস্য নিপুণ ও নিখুঁতভাবে কোন প্লেন বা মিসাইলকে 'গাইড' করে কয়েক হাজার মাইল দূরে ভিন্ন মহাদেশে নির্দিষ্ট জায়গায় নিখুঁত ভাবে নামিয়ে আনতে পারে, কিন্তু আজো আমাদের দেশে অসহায় অন্ধ ও খোঁড়া মানুষেরা রাস্তা চলতে মধ্যযুগের মত হোচট খেয়ে পড়ে। বহু হাজার মাইল দূরের শত্রুপক্ষীয় কোন মিসাইল চেনবার বিস্তর কলা-কৌশল আমরা পাকা করেছি, কিন্তু আমার অতি কাছে ঘরের ভেতরকার প্রকৃত শত্রুরা আজো অচেনাই রয়ে গেছে। সারা পৃথিবীতে ষাট কোটী লোক আজো অনাহারে থাকতে বাধ্য হয়। অসুখ, নোংরা পরিবেশ আর দারিদ্র্য আজো ব্যাপক।

অস্ত্র নির্মাণে আজ আমরা এমন এক চরম 'সাফল্যের' শিখরে পৌঁছেছি, যা দিয়ে যাবতীয় ধনসম্পত্তি অক্ষত রেখে সকল মানুষকে মেরে ফেলতে পারি, অথচ এই খোদ ইউরোপের হৃদকেন্দ্রেও আমরা মানুষের দারিদ্র্য দূর করতে পারি না। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর (EEC) এক রিপোর্টে দেখা যায় ইউরোপীয় বাজার অঞ্চলেই অন্ততঃ 130 লক্ষ মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে এবং সংখ্যাটি তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে আরো অনেক বেশী। আমাদের মূল্যবোধ এমন এক স্তরে পৌঁছেছে, যাতে বৃটেনের মত দেশেও শতকরা 50 জন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্ মারণাস্ত্র নির্মাণ ও উন্নয়ণের কাজে সারাজীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন —অথচ অন্তরের অন্তস্থলে এরা সবাই জানেন যে ওই সব অস্ত্র যদি কখনো ব্যবহার হয়, তবে যে মানবজাতিকে আমরা জানি তা নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাবে।

আমাদের ভবিষ্যতের পূর্বনির্দিষ্ট কোন আকৃতি বা অবয়ব নেই। আমার আপনার মত লোকেদের দ্বারাই এই ভবিষ্যৎ তৈরী হবে। এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বাছাইয়ের প্রকৃত সুযোগ আছে।

সামরিক চক্রগুলি থেকে মানুষ ও সমাজের উপযোগী যদি কিছু উপজাত হয়, তাও হয় কনকর্ডের মত সুপারসনিক অত্যাধুনিক প্লেন বা ঐ জাতীয় কিছু, অথচ আমাদের সমাজে অবসরপ্রাপ্ত বৃত্তিভোগী মানুষরা ঠাণ্ডার কষ্টে মারা যায়। মিসাইল সিস্টেম সহ নানাবিধ সামরিক প্রয়োজনে সঙ্কেত ও সংবাদাদি পাঠানোর জন্য এমন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে পৃথিবীর যে কোন স্থানে মুহূর্তের মধ্যে সংবাদ পাঠানো যায়, অথচ বর্তমান যুগের আগে নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটনে একটা সাধারণ চিঠি পাঠাতে যে সময় লাগতো, আজ তার চেয়ে বেশী সময় লাগে। যুদ্ধাস্ত্র তৈরীর বিজ্ঞান থেকে যে সব কৌশল পাওয়া গেছে তাতে এমন মোটর গাড়ী তৈরী করা গেছে যা ঘণ্টায় 120 কি.মি. বেগেও সুস্থির থাকে, অথচ নিউইয়র্ক সহরের মধ্যে যানবাহনের গড় গতিবেগ ঘণ্টায় মাত্র 11 কি.মি.। অথচ এই শতকের শুরুতেও ঘোড়ায় টানা যানবাহনের গড় গতিবেগ ছিল 17 কি.মি.। এই করুণ ইতিহাস কিছুটা অন্তত উল্টানোর প্রচেষ্টায় লিউকাস কর্মীরা তাদের যৌথ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এই কাজ করতে গিয়ে কিরূপ প্রতিকূল শক্তির মুখোমুখি হতে হয়, তা বোঝানোর জন্য এই কোম্পানীটির প্রকৃতি ও ব্যাপক প্রভাব সম্বন্ধে আমি কিছু বলব।

লিউকাস এয়ারোস্পেস হল এমন একটি বহুজাতিক সংস্থা (transnational corporation) যার কর্মীসংখ্যা ইংলণ্ডেই পঁচাত্তর হাজার, অন্য দেশে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে

প্রচুর পরিমাণ পুঁজি রপ্তানী লিউকাসের সাম্প্রতিক বৈশিষ্ট্য। পাছে এই কোম্পানী ফ্রান্সে ঢুকে শিল্পোৎপাদনের একাংশে একচেটিয়া আধিপত্য গেড়ে বসে, ভয়ে ভয়ে তাই ফরাসী সরকার এদের ঢুকতে না দেবার উদ্দেশ্যে বিশেষ আইন প্রণয়ন করেছিল। বহুজাতিক এইসব কর্পোরেশনের ভয়ে বহু রাষ্ট্রই আতঙ্কিত বোধ করে। যে সব দেশে শ্রমিকরা সুসংগঠিত নয়, যেসব দেশে সম্পদ উন্নয়ন ও আহরণের সম্ভাবনা আছে, সে সব জায়গায় কোম্পানীটি দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট অনেক কোম্পানীকে গ্রাস করে 1960-এর দশকের শেষ দিকে কোম্পানীটির এয়ারোস্পেস বিভাগটি শুরু হয়। এ হল এক ধরনের শিল্প পুনর্বিন্যাস যা দেখা গেছে সুইডেনের জাহাজ শিল্পে, পশ্চিম জার্মানীর অটোমোবাইল শিল্পে, এবং অন্যত্র। কতকগুলো কারখানা ছিল ছোট, যাতে শ'তিনেক লোক কাজ করে, কতগুলি বড়ও ছিল যাতে হাজার তিনেক লোক কাজ করে। এবং এইরকম 17টিকে একত্র করে ইংলণ্ডের লিউকাস এয়ারস্পেস বিভাগের কর্মীর সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় 18 হাজার।

আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, কোম্পানী আরো পুনর্বিন্যাস (rationalisation) করবে, কিছু ফ্যাক্টরী বন্ধ করে দেবে, এবং একটিকে আর একটির বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেবে। যাতে এটা না করতে পারে তার জন্য আমরা এমন এক সংগঠন গড়ে তুললাম যা বৃটেনের শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাসে আজো অনন্য। এর নাম হল Lucas Aero-space Corporation Shop Stewards Committee এবং এর মধ্যে পদস্থ টেকনোলজিস্ট থেকে কারখানা ঘরের সাধারণ কর্মীও যুক্ত হল। আমার মনে হয় কারখানা ঘরের সাধারণ কর্মীদের স্বাভাবিক বুদ্ধি পদস্থ টেকনোলজিস্টদের জ্ঞানের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংগঠনটিকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার আগে বিভিন্ন কারখানার কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ দৃঢ়তর করবার জন্য এবং মালিকপক্ষ ছাড়া ভিন্ন সূত্র থেকে সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ করার জন্য আমরা আমাদের নিজস্ব খবরের কাগজ বার করলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের পত্রিকা জমে উঠলো।

আমাদের কমিটি ভালোভাবে কাজ শুরু করার আগেই কোম্পানী জানাল যে তারা লণ্ডনের শ্রমিক বহুল অঞ্চলে একটি পুরানো কারখানা বন্ধ করে দেবে। এখানে 1972 সাল নাগাদ প্রায় 1500 লোক কাজ করতো। আমরা ল্যাবরেটারিগুলি সহ কারখানাটি দখল করে থাকলাম যাতে কোম্পানীটি যন্ত্রপাতি আনা-নেওয়া না করতে পারে। আসলে আমরা আগের মতই দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করার অধিকারের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলাম। এভাবে আন্দোলন চালিয়ে কি লাভ হতে পারে তাতে কর্মীদের মনে দ্বিধা সন্দেহ বাড়ছিলোই এবং ক্রমে সপ্তাহ ছয়েকের মধ্যেই তাদের মনোবল এত কমে গিয়েছিলো যে শনি-রবিবার তারা দখল রাখার জন্য কারখানায় থাকতোই না। এ খবর শুনে কোম্পানীর একটা দল ফ্যাক্টরীর ছাদ ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে দামী যন্ত্রপাতি বার করে নিয়ে গিয়ে পুরো ফ্যাক্টরীটাকেই আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিল। ফুটবল ম্যাচে ছেলেরা যখন খুনোখুনি মারামারি করে তাকে আমাদের দেশে গুণ্ডামী বলে নিন্দা করা হয়। কিন্তু এখানে একটা কোম্পানী ঠাণ্ডা মাথায় সুপরিকল্পিতভাবে এক রাতের মধ্যে এতগুলো লোকের জীবনধারণের উপায়টিকেই নষ্ট করে দিয়ে যা করলো সেই গুণ্ডামীর আমি কোন তুলনা দেখি না।

আমরা পরাস্ত হলাম। কি ব্যক্তিগত ক্ষেত্র, কি সমাজজীবন বা কর্মক্ষেত্র যেখানেই আপনি পরাজিত হোন, আমার মনে হয় সেই পরাজয়কে বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা উচিত, যাতে পরবর্তী অধ্যায়ের সংগ্রামকে সৃজনশীলভাবে, সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করা যায়। এই বিষয়ের পর যে আলোচনা হল তাতে একজন শ্রমিক একটা সহজ প্রশ্ন রাখলো। সে বললো, "আমরা যে ক্ষমতা ও দক্ষতা এতদিন ধরে অর্জন করেছি তাকে কি আমরা সমগ্র সমাজের প্রয়োজন মেটানোর কাজে লাগাতে পারি না? মারার উপকরণ তৈরীর বদলে আমরা কি মানুষের কল্যাণের জন্য, সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র তৈরী করতে পারি না?" এই কাজে যাবার আগে আমরা আমাদের সকলের যোগ্যতা ও দক্ষতার মূল্যায়ন করা দরকার মনে করলাম। এবারে যে পদ্ধতি বর্ণনা করবো তা আমার মতে যে কোন শহর, যে কোন শিল্প-কারখানা, দেশের যে কোন অংশ এমন কি সমগ্র দেশের বেলাতেও প্রযোজ্য।

আমাদের শ্রমিকরা, কর্মীরা বিভিন্ন কারখানা ও ল্যাবরেটারি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। তারা দেখতে পেল আমাদের উচ্চ তাপ ও উচ্চ চাপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার বন্দোবস্ত আছে, বন্দোবস্ত আছে দূরের ও কাছের আকাশের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করার। দেখা গেল, নানা কাজে আমাদের কর্মীরা ইংলন্ডের দক্ষতম কর্মীদের একাংশ, যদিও আজ আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের পরবর্তী কাজকর্মে ঐসব দক্ষতা খুব একটা কাজে লাগেনি। খুব ভালো ভালো ও চমকপ্রদ অনেক কাজ অদক্ষ বা আংশিক দক্ষ শ্রমিকরাই করেছে। নানারকম এঞ্জিনের অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশ, সম্পূর্ণ গ্যাস টারবাইন থেকে আকাশে প্লেন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইলেকট্রনিকস্ কম্পুটার, অনেক কিছুই আমাদের কর্মীরা করতো। লিউকাস কর্মীরা জীবনে এই প্রথম জানতে পারলো, বিভিন্ন ল্যাবরেটারী ও কারখানাগুলিতে প্রকৃতপক্ষে কী হয়। যে যন্ত্র বা ডেস্কে আমরা কাজ করি তার মধ্যে দিয়েই আমরা জগৎ ও জীবনকে দেখতে অভ্যস্ত হই। যে শিল্প-কারখানায় আমরা কাজ করি তাকে পূর্ণভাবে দেখতে, জানতে বা তার সাথে সমাজের অন্যান্য লোকদের প্রয়োজনের কি সম্পর্ক তা বুঝতে কর্মীদের কখনোই উৎসাহ দেওয়া হয় না।

সমগ্র তথ্য সংগ্রহ করে—সমাজ আমাদের যেমন ভাবে শিখিয়েছে—তেমনি করেই আমরা এগুতে লাগলাম। আমাদের ক্ষমতা ও দক্ষতা নিয়ে কি করা যায় পরামর্শ চেয়ে আমরা 180 জন নামকরা বিশেষজ্ঞকে চিঠি লিখলাম। আমরা লিখলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের যাঁরা

বিদ্যামন্দিরের শান্ত কক্ষে প্রচুর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা অনেক দিয়েছেন, আমরা লিখলাম বেশ কিছু বিশাল বুদ্ধিজীবীদের যাঁরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে কি করে সমাজমুখী করা যায়, তার উপর মস্ত মস্ত বই লিখেছেন, আমরা সংশ্লিষ্ট পেশাগত সমিতি (professional bodies)-গুলির সকলকে লিখলাম, লিখলাম আমরা বড় বড় ট্রেড ইউনিয়নগুলির মাতব্বরদের। দেখা গেল, 180 জনের মধ্যে মাত্র তিনজনের উত্তর সামান্য কাজে লাগতে পারে। বাকীদের কাছ থেকে আবছা কিছু সাধারণ কথা শোনা গেল মাত্র। কেউ জানালেন "1972 সালে বোস্টনে আমি যে পেপার দিয়েছিলাম তার নির্দেশিকার 32 নং সূত্র আপনাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক হতে পারে।" যাকে ভিত্তি করে শিল্প শ্রমিকরা সংগঠিত হতে পারে অথবা যে সব বাস্তব সমস্যা তাদের উৎপীড়িত করছে তাদের মোকাবিলা করা যায়, এমন কোন নির্দেশ কারো কাছ থেকেই পাওয়া গেল না। অনেক আগেই যা করা উচিত ছিল, আমরা তাই করলাম অবশেষে। আমরা কি করতে পারি, আমাদের কি করা উচিত, এবিষয়ে আমাদের কর্মীদের কাছেই প্রশ্ন রাখলাম। সবগুলো ফ্যাক্টরীতে আমরা আলোচনা শুরু করলাম এবং তারপর এক প্রশ্নতালিকা আমরা বানালাম। আমরা যে সংবাদ, যে আইডিয়া ও সৃজনশীলতা শ্রমিকদের থেকে আশা করছি তা শ্রমিকদের থেকে বার করে আনবার জন্য কি করে প্রশ্নতালিকা প্রস্তুত করা যায় তার জন্য আমরা কিছু সমাজবিজ্ঞানীর সাথে পরামর্শ করলাম। এই সমাজবিজ্ঞানীদের ভিতর বাম ও দক্ষিণ উভয় পন্থীই ছিলেন এবং তাঁদের একজন আমাদের বললেন: "প্রশ্নতালিকা তৈরী করার সময় সর্বদা একটা কথা মনে রাখবেন—প্রশ্ন যেন এমন না হয় যাতে উত্তরদাতার চেতনার পরিবর্তন ঘটে যায়। যাদের নিয়ে রিসার্চ তাদের চেতনাস্তরের পরিবর্তন উচিত নয়। বাইরে থেকে বিজ্ঞানসম্মত-ভাবে অনুসন্ধানই কাম্য।"

এটা আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয়, "আপনি কি মনে করেন সাধারণ লে কেরা (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির) সমস্যাবলী নিয়ে কাজ করতে পারেন?" সারা জীবনে আমি একটাও সাধারণ লোক দেখিনি। যাদের দেখিছি তারা সবাই অসাধারণ। তাদের নানা রকম দক্ষতা, কর্মক্ষমতা, প্রতিভা আছে এবং তাদের সেই সব প্রতিভাকে খুব কমই উৎসাহ দেওয়া হয় বা বিকশিত হতে সাহায্য করা হয়।

আমরা কিন্তু ইচ্ছে করেই এমনভাবে প্রশ্নতালিকা প্রস্তুত করলাম যাতে এর উত্তর দিতে উত্তরদাতাকে তার সমস্ত মন ও চেতনাকে এইদিকে ঢেলে দিতে হয়। আমরা বন্ধুদেরকে বললাম, একদিকে উৎপাদক অপর-দিকে ভোক্তা এই দ্বৈত ভূমিকার কথা মনে রাখতে, আমরা বললাম তাঁরা যেন মনে রাখেন যে আজ তাঁরা যা করছেন তার উপর নির্ভর করছে শুধু আজকের চাহিদা পূরণ নয়,সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনও। ছ' সপ্তাহের মধ্যেই আমরা জনসাধারণের অবিশ্বাস্য এক সৃজনশীলতার পরিচয় পেলাম। আমাদের কি করা উচিত এ বিষয়ে বড় বড় গবেষণা প্রবন্ধ লোকে লিখুক এটা আমরা চাইনি। আপনাদের সুইডেনের ব্যাপার আমি ভালো জানি না, তবে আমাদের বৃটেনে ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর দক্ষতাকে আমরা বুদ্ধির সাথে গুলিয়ে ফেলি। একটা লোক কি করে তা দিয়ে নয়, সে কি বলে ও লেখে তাই দিয়েই আমরা বেশী আকৃষ্ট হই। আমার অভিজ্ঞতায় শিল্প-শ্রমিকরা তাদের কাজ ও সংগঠনের মাধ্যমেই তাদের বুদ্ধিকে প্রকাশ করে, কথা গুছিয়ে বলার দক্ষতার মাধ্যমে নয়। কর্মীবাহিনীর উদ্দেশ্যে আমরা তাই বললাম: "যে জিনিসগুলো তৈরী হওয়া দরকার মনে করেন, আসুন, তার মডেল বানিয়ে ফেলুন, আর তা নিয়ে যদি বক্তব্য রাখতে চান, আসুন আপনার কথা আমরা শুনি, আলোচনা করি।

যে 150-টা উত্তর আমাদের হাতে এল সেগুলিকে ঘষে মেজে গুছিয়ে ছ'টি গ্রুপে আমরা সাজিয়ে ফেললাম। সংক্ষেপে এদের কয়েকটির বর্ণনা আমি দেব। প্রথম ধরনের দ্রব্যাদি চিকিৎসা সম্পর্কিত। বিমূঢ় আতঙ্কের সাথে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম, সামাজিক উপকারিতা আছে এমন যে দুটি মাত্র জিনিস আমরা তৈরী করতাম, কোম্পানী "র‍্যাশনালাইজেশন" প্রোগ্রামের অঙ্গ হিসাবে তাদের উৎপাদনও বন্ধ করে দিয়েছে। একটা হল দুর্বল হার্টের লোকেদের জন্য পেস-মেকার, আর একটি হল কিডনীর জন্য ডায়ালিসিস এ্যাপারেটাস। বৃটেনে কিডনী মেশিনের চাহিদা অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা জানতে পারলাম যে প্রতি বছর আমাদের দেশে অন্ততঃ 3000 লোক ঐ মেশিন না পাওয়ার জন্য মারা যায়.....অনুরূপ অবস্থা আছে সুইডেনে, পশ্চিম জার্মানীতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। অথচ আমরা মাইক্রোপ্রসেসার দিয়ে এমন যন্ত্র বানিয়েছি যা রোগীরা সহজে পিঠে বয়ে নিয়ে বেড়াতে পারে।

যেসব শিশুর শিরদাঁড়ার গুরুতর অসুখ আছে তাদের জন্য আমরা একটা চমৎকার গাড়ী তৈরী করেছি। প্রায়ই প্রশ্ন করা হয়, আমরা এ সবের খরচা পাব কোথা থেকে? অথচ খুব কমই জিজ্ঞাসা হয় করা এসব বা এমন সব কিছু না করার মূল্য কত? একজন লোক যদি বেকার হয়ে যায় তবে তার ও তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য শিল্প শ্রমিকদের গড় আয়ের প্রায় 60%তাকে গভর্নমেন্টের থেকে দিতে হয়। এবং তার চাকরী থাকলে সরকার যা তার কাছে থেকে পেত, তাও পায় না। দুটো যোগ করলে প্রত্যেক বেকার হওয়ার জন্য সরকার একজন শিল্পশ্রমিকের গড় আয়ের 100%এর সমান টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

আমরা বৃটেনের তৎকালীন লেবার গভর্ণমেন্টের কাছে গিয়েছি এবং বলেছি: "ঐ টাকাটা আমাদের দিন, আমরা সমাজের মঙ্গল হয় এমন সব ভালো ভালো জিনিস উৎপাদন করে দিচ্ছি।" স্বভাবতঃই আমাদের কথা এত স্বাভাবিক বুদ্ধি অর্থাৎ 'কমনসেন্সে' ভরা যে পলিটিশিয়ানদের বোধের তা বাইরে, এবং আমাদের কথার উত্তরও তারা স্বভাবতঃই দিতে পারেনি। বেকার থাকার সামাজিক ক্ষতি এবার আমরা হিসাব করলাম।

বেকারীত্ব লোকের মধ্যে মাদকদ্রব্য সেবন প্রবণতা বাড়ায়, মানসিক ব্যাধি, সমাজবিরোধী কাজকর্ম বাড়ায়। এইসব ক্ষতি হিসাব করলে দেখা যায়, বড় বড় কর্পোরেশনগুলি র‍্যাশানালাইজেশন করে আরো বেশি লোককে কর্মচ্যুত করলে সমাজের কি ক্ষতি হয়।

আমাদের সমাজ এখন যেভাবে শক্তি ও সম্পদের অপচয় করে চলেছে এমন বেশিদিন করা যাবে বলে আমরা মনে করি না। শক্তি সংরক্ষণ ও অপচয় বন্ধ করার জন্য আমরা বহু ধরনের কৌশল ও ব্যবস্থাদি উদ্ভাবন করেছি। এদের মধ্যে একটা হল একটা তাপীয় পাম্প যা একটি ইন্টারন্যাল কম্বাসান এঞ্জিনে প্রাকৃতিক গ্যাসে চলে। প্রাকৃতিক গ্যাস সোজা না পুড়িয়ে এর ভিতর পোড়ালে আপনি 2·8 গুণ বেশী কার্যকরী শক্তি পাবেন, আর বিদ্যুৎ দিয়ে চালালে পাবেন প্রায় দু'গুণ। লিউকাস বলেছিলো, এই সব যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামগুলি তাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদির ধরনের সাথে মানায় না এবং এগুলো লাভজনকও নয়। অথচ কোম্পানীর একটা গোপন রিপোর্ট আমরা হস্তগত করতে পেরেছিলাম, যাতে দেখা যায় যে 1986 সালের মধ্যেই ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর (EEC) ভিতর এর বাজার দাঁড়াবে প্রায় 100 কোটি পাউন্ড মূল্যের। কিন্তু লিউকাস এগুলো উৎপাদন করবে না, কারণ তাহ'লে এটা মেনে নিতে হয় যে শ্রমিক কর্মীরাই কী জিনিস কেমন করে কার ভোগের জন্য বানানো যায় তা বলতে পারে। তাহলে দেখুন, আমাদের শুধু একটি অর্থনৈতিক সংস্থার সাথেই কাজ করতে হচ্ছে তাই নয়, আমাদের কাজ করতে হচ্ছে এমন একটি সংস্থার সাথে যার প্রকৃতি রাজনৈতিকও বটে, কারণ তারা তাদের ক্ষমতার দাপট দেখাতে চায় এবং সেই ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চায়।

আমরা মোটর গাড়ীর কোচ ও ট্রেনের জন্য একটি মিশ্রশক্তি উৎসও (hybrid power pack) বানিয়েছি। আপনারা জানেন কিনা জানিনা, আপনার মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনটি যত বড় হওয়া প্রয়োজন, শুধু চালানো শুরু করার জন্যই প্রকৃতপক্ষে তার চারগুণ বড় ইঞ্জিন রাখতে হয়। গাড়ী একবার চলতে শুরু করলে কিন্তু খুব ছোট ইঞ্জিনই যথেষ্ট। অপরদিকে ইলেকট্রিক মোটরের প্রাথমিক চালিকা শক্তি (starting torque) দেবার ক্ষমতা বেশী। সুতরাং আমরা এই দুটিকে একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে মিশ্রশক্তি উৎস বানিয়েছি। রাস্তার মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়ালে বা জ্যামে পড়লে এখনকার মত এত বেশী শক্তির অপচয় হবে না, যদি এই মিশ্রশক্তি উৎসটিকে ব্যবহার করা হয়। এইভাবে শতকরা 50%শক্তি বাঁচানো যায়, এবং বিষাক্ত গ্যাস দ্বারা পরিবেশ দূষণ শতকরা 50% কমানো যায়।

আমাদের উদ্ভাবনের বিশেষত্ব এই যে আমরা এমন সব জিনিসপত্র দিয়ে গাড়ী বানিয়েছি, বেয়ারিংগুলিকে এত মোটা সাইজের করেছি, যে মাঝে মাঝে মোটামুটি যত্ন নিলেই এ দিয়ে বিশ বছর অনায়াসে চালানো যাবে। তাছাড়া আপনার গাড়ী আপনিই দরকার মত যাতে সারিয়ে নিতে পারেন সে কথা মাথায় রেখেই আমরা গাড়ী তৈরীর পরিকল্পনা করেছি। এতে অবশ্য কেউ কেউ বলবেন ঃ "এরকম করলে দেশে বেকারী বেড়ে যাবে।"

জেনেভার বেটেল ইনস্টিটিউট (Batelle Institute) থেকে সম্প্রতি একটা রিপোর্ট পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় যে কুড়ি বছর চলতে পারে এমন গাড়ী যদি তৈরী করা যায় তবে শুধু শক্তি ও সম্পদের সংরক্ষণই সম্ভব নয়, শতকরা 65% বেশী কর্ম সৃষ্টিও সম্ভব। এবং এতে যে ধরনের কাজ সৃষ্টি হবে সেগুলো সৃজনশীল, "জীবন্ত মানুষের" উপযোগী—সারাই করতে ধাঁধাঁ সমাধান করার আনন্দ পাওয়া যেতে পারে এবং কাজ থেকে কর্মী বিচ্ছিন্ন (alienated) হয় না, যেরকম হয়ে থাকে বড় কারখানার আধুনিক "প্রোডাকশান লাইনে"।

আমাদের সেই 'হাইব্রীড পাওয়ার প্যাক'কে 'একটা হাইব্রীড রোড রেল' যানে জুড়ে দিয়ে একটা অপূর্ব গাড়ী আমরা বানাতে পেরেছি যা রাস্তায় মোটর গাড়ীর মত চলে আবার রেল লাইনেও (প্রধানতঃ ব্রাঞ্চ লাইনে) চলতে পারে। এই যানটির পরিকল্পনায়, এমনকি এর কল্পনায়ও, টেকনোলজির বেশ কয়েকটি স্তর বা দিক সম্বন্ধে আমাদের ভাবতে হয়েছিলো। প্রথমে আমরা চিন্তা করলাম গাড়ী সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনদাতারা কি বলে। গাড়ীকে সব সময়েই নতুন ও চকচকে দেখানো হয়, এতে প্রয়োজনাতিরিক্ত চারগুণ বেশী শক্তির এঞ্জিন দেওয়া হয়, এবং তার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ গতিবেগ মোটররাস্তায়ও তোলা যায় না। বিজ্ঞাপনগুলিতে এমন ভাব দেখানো হয় যে আপনি আপনার নিজের ও পরিবারের ভীষণ ক্ষতি ও মর্যাদাহানি করে ফেললেন, যদি দু-তিন বছর অন্তর অন্তর নতুন মডেলের নতুন গাড়ী আপনি না কেনেন। এগুলো তৈরীই এমন-ভাবে করা হয় যাতে দু-তিন বছর বাদেই যন্ত্রপাতি আলগা হয়ে যেতে থাকে। মোটর গাড়ীকে সব সময়ই সুন্দর শান্ত গ্রামীণ পরিবেশে এমনভাবে দেখানো হয় যেন আপনার বিশ্রী কর্মজীবন থেকে সন্ধ্যেবেলায় বা সপ্তাহ শেষে সে আপনাকে দিচ্ছে একটু আরামের অবসর আর মুক্তি।

বাস্তবের দ্বিতীয় দিক হল, মোটর গাড়ী সহরগুলির কি ক্ষতি করছে। পুরাতন প্রাসাদগুলিকে নষ্ট করছে, শহরের বাতাসকে বিষিয়ে তুলছে। বাস্তবের তৃতীয় দিক হল, এই মোটর গাড়ী শক্তি ও সম্পদের কি শোচনীয় নিদারুণ সর্বনাশ করছে। 80,000 মাইল বা দু'বছরের কমে যদি আপনাকে গাড়ীটি ফেলে দিতে হয় তবে শক্তি ও সম্পদেরই যে বিপুল অপচয় হয় তাই-ই না, আরো খারাপ হল দিনরাত গাধার খাটুনি খেটে অনেক লোকে যা উৎপন্ন করল তার বৃহদংশকে 'রাবিশ' বলে ফেলে দেওয়া হল। এবারে আমাদের আগের সেই রোড-রেল মোটরের কথায় ফিরে আসি। কিভাবে এই গাড়ীকে রেল-লাইনে ব্যবহার করা যায়! ক্যানাডিয়ানরা যেমন করেছে আমরা তার চেয়েও ভালো করতে পারলাম। রাস্তা থেকে লাইনে, লাইন থেকে রাস্তায় নামা-ওঠার বন্দোবস্ত করে আমরা

এই গাড়ীর একটা ছোট 'প্রোটোটাইপ' করলাম এবং ট্রায়ালে এটা চমৎকার কাজ করল।

এই যানটির পরিকল্পনায় অযথা জটিলতা বাড়িয়ে একে ভয়ংকর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সৃষ্টি বলে না দেখিয়ে একে আমরা যথাসম্ভব সরল করলাম। এয়ারোস্পেস ও সামরিক শিল্পচক্রে আমরা সব জিনিসকে অযথা জটিল করে আনন্দ পেতাম। সাধারণতঃ কোনো কাজে আমরা মস্ত বড় বড় গাণিতিক ফর্মুলা ব্যবহার করি এবং সেগুলোকে বাস্তবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করি। না মিললে আমরা আবার ফর্মুলাকে সংশোধন, পরিবর্তন করি যাতে তা বাস্তবের সাথে মেলে। এমনি করে আমরা বড় জটিল গাণিতিক ফর্মুলায় উপনীত হই বা দেখে লোকে আমাদের ভয়ংকর পন্ডিত, বিরাট বৈজ্ঞানিক ভাবতে থাকে। কিন্তু সাধারণ যারা বাস্তব কর্মী, যারা কারখানায় সত্যিকারের কাজ করে, তারা এসব ফর্মুলার ধার ধারে না, বোঝেও না। অথচ কাজটা ঠিকমত করে দিতে পারে।

আমরা একজন দক্ষ প্রবীণ শ্রমিককে জিজ্ঞাসা করলাম "কি-সাইজের এ্যাক্সেল (axle) নেওয়া উচিত (আমাদের রোড-রেল যানের জন্য) ?" সে বলল 35 মিলিমিটার। আমরা সেই মাপেই এ্যাক্সেল করলাম এবং সেটা চমৎকার কাজ করলো। আর, ঐ লোকটির পরামর্শ তো সুফল দেবেই, কারণ সেই লোকটি জীবনের 20 বছর এ্যাক্সেল ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ তৈরীতে অতিবাহিত করেছে। অন্যভাবে বলা যায়, আমরা ঐ লোকটির মহামূল্যবান বাস্তব প্রজ্ঞাকে কাজে লাগালাম। ঐ প্রজ্ঞা হল, পোলানির (Polanyi) ভাষায়, "কতকগুলো জিনিস আছে যা আমরা অন্তর দিয়ে জানি, কিন্তু সব সময় ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না।" এই বাস্তব জ্ঞানকে কাজে লাগালে কোনো বিষয়ে পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার গণতন্ত্রীকরণ করা সম্ভব এবং তথাকথিত সাধারণ লোকদেরও সংযুক্ত করা সম্ভব। আমরা তখন সব ফ্যাক্টরীগুলি থেকে চাঁদা তুলে একটা পুরোনো কোচ কিনলাম। এবং নর্থ-ইস্ট লন্ডন পলিটেকনিকে আমাদের অভিনব (জনবিজ্ঞান) কেন্দ্রে আমাদের নতুন ('হাইব্রীড') গাড়ী বানিয়ে ফেললাম। সাসেক্স রেললাইনে এটাকে আমরা পরীক্ষা-মূলকভাবে চালালাম এবং এটা চমৎকার চলল। রাস্তায় বা রেললাইনে আমরা এখন সারাদেশে যত্রতত্র অবাধে চলাফেরা করতে পারি। আমাদের কোচে ভিডিও আছে, স্লাইড আছে এবং যে কোন জনপদে গিয়ে আমরা লোককে দেখাতে পারি, পরিবেশের পক্ষে অক্ষতিকর পরিবহন ব্যবস্থা কেমন হতে পারে। যখনই বেকার সমস্যার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল কোথায়ও হয় সেখানে আমাদের এই অভিনব যানটি মিছিলের আগে থাকে এবং আমরা লোককে দেখাই শ্রমজীবী জনসাধারণ কি করতে পারে।

যেসব বাচ্চাদের শির-দাঁড়ার অসুবিধে আছে তাদের জন্য আমরা একটা গাড়ীও ("বব-কার্ট") বানিয়েছি। এই সুন্দর সহজ সরল জিনিসটি বানিয়েছেন প্যারী ইভান্স, যিনি হলেন বর্তমান দুনিয়ার একজন প্রথম শ্রেণীর প্রযুক্তিবিদ্ (system designer)। তিনি বলেছেন গাড়ীটি বানিয়ে পাঁচ বছরের এক বাচ্চাকে যখন তিনি বসালেন তখন তার চোখে মুখে যে আনন্দ দেখেছেন, তা সামরিক শিল্পচক্রের বিমূর্ত সমস্যাগুলির চেয়ে ঢের বেশী অর্থবহ। এই প্রথম তিনি যে জিনিসটির নক্সা বানালেন তার প্রকৃত ব্যবহারকারীকে তিনি স্বচক্ষে দেখলেন, এবং সমস্যাটির সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংযোগ ঘটল। কারণ কাদামাটি দিয়ে বাচ্চাটির পিঠের ছাঁচ তাঁকে নিতে হয়েছিল। লিউকাস কোম্পানী বব-কার্ট উৎপাদন করতে রাজী হয়নি কারণ এগুলি নাকি তাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদির সাথে মিল খায় না। বস্টালের তরুণদের জন্য জেলখানায় প্রায় শ' পাঁচেক এইরকম বব-কার্ট এ পর্যন্ত তৈরী করা হয়েছে। সমাজ-কর্মীরা লক্ষ্য করেছেন যে এই কাজগুলি তরুণ অপরাধীদের ভিতর মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তুলেছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 1800 সাল নাগাদ শতকরা 85 জন লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। ক্রমে ক্রমে কৃষিব্যবস্থায় এমন "অটোমেশন" এল যে ট্রাক্টরগুলি নিজেরাই মাঠে চলে ফিরে বেড়াতে আরম্ভ করল এবং এখন শতকরা 4 জন মাত্র লোক আগের চেয়ে অনেক বেশী উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু ট্রাক্টর, ফসল কাটার যন্ত্রপাতি, কৃষি রাসায়নিক প্রভৃতির মাধ্যমে যে পরিমাণ শক্তি মাঠে ঢালা হয়, কৃষিতে উৎপন্ন শক্তি তার চেয়ে কম। অটোমেশনে উৎপাদন (production) বাড়ে না, বাড়ে উৎপাদনহার বা উৎপাদিকা শক্তি (productivity)। এ দুটোয় গুলিয়ে ফেললে ভুল করা হবে। যেমন ধরুন, টেলিফোন শিল্পে উৎপাদন। এক ইউনিট (one unit of equivalent switching power) উৎপাদন করতে পুরোনো প্রযুক্তিতে লাগতো 26 জন লোক, প্রথম প্রজন্মের ইলেকট্রনিকসে লাগে 10 জন, আর কিছুদিনের মধ্যেই সেটা একজনেই করতে পারবে। কিন্তু উৎপাদন বিশগুণ বেড়ে যাবে এমন বোধহয় কেউই বলবেন না। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সংস্থার এক সাম্প্রতিক রিপোর্টে দেখা যায় যে 1988 সালের মধ্যে উক্ত সংস্থাভুক্ত দেশগুলিতে দু' কোটি লোক কর্মচ্যুত হবে। যত বেকারী বাড়বে ততই সমরাস্ত্র ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম উৎপাদনের কারখানা বাড়ানোর ধুয়ো তোলা হবে। বেকার সমস্যা কমানোর এটাই নাকি পথ।

আমরা মনে করি, সমরাস্ত্র উৎপাদনশিল্পের বিস্তার করে বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টার বিপরীতে আরো ভালো ও বাস্তব বিকল্প সম্ভব, এবং তা আছেও। মানুষের পক্ষে কাজ ভীষণ প্রয়োজন। আমরা মনে করি একটি অর্থবহ উৎপাদন ব্যবস্থায় সঠিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এমন কাজ চাই যাতে পরিশ্রম ও বুদ্ধি, হাত ও মাথা দুই-ই লাগে এবং যেখানে উৎপন্ন দ্রব্য থেকে উৎপাদক বিচ্ছিন্ন (alienated) নয়। একটা লোককে আপনি জিজ্ঞেস করুন "আপনি কে ?" কেউ বলবে "আমি একজন ফিটার", কেউ বলবে সে টার্নার, কেউ শিক্ষক, কেউ নার্স ইত্যাদি। (এটা পরিতাপের বিষয়) কেউই বলবে না আমি 'বেঠোফেন সঙ্গীতপ্রেমী' 'জেমস্ জয়েস সাহিত্যপ্রেমী' বা 'বব্ ডীলান প্রেমী'।

পরস্পরের সঙ্গে এবং সমাজের সঙ্গে কাজের মাধ্যমেই আমরা সম্পর্কিত। পারিপার্শ্বিক জগতের উপর ক্রিয়া করে আমরা শিখি, বিকশিত হই।

আগে যুক্তি শোনা যেত যে নতুন বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে উৎপাদন খুবই আকর্ষণীয় ও উত্তেজনাপূর্ণ। বিস্তর শিল্প-সমাজতাত্ত্বিকরা এসব কথা বলেছেন। গাণিতিক প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজকর্ম করলে কি হয়, তা আমরা অনুসন্ধান করে দেখেছি। দেখা গেছে, এসবে মানুষের কর্মদক্ষতা অবিশ্বাস্যরূপে কমে যায়। প্রযুক্তির বিখ্যাত জার্নাল 'আমেরিকান মেশিনিস্টে'র এক সাম্প্রতিক রিপোর্টে দেখা যায় যে অটোমেশন যন্ত্রপাতিতে কাজ করবার লোকের আদর্শ মানসিক বয়স হওয়া দরকার মাত্র বারো। একজন আমেরিকান সোসিওলজিস্ট বলেছেন যে কাজে ঢোকবার আগে যদি নাও থাকেন, এইসব যন্ত্রপাতিতে অনেকদিন কাজ করলে একজন সুস্থ স্বাভাবিক লোক অবশ্যই মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে যাবেন।

এইসব প্রযুক্তির বিপরীতে সত্যিই ভালো বিকল্প আছে……আমার Architect or Bee বইতে এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত লিখেছি।……

কম্পুটার বিজ্ঞানীদের ভিতর আজ ব্যাপক ও বিরাট দুর্ভাবনা যে আমরা বাস্তব জগৎ থেকে এত দূরে সরে কাজ করছি যে কোথায় কি করছি সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যথেষ্ট অবাস্তব হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে।

এই ধরনের যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতিতে কাজ করার আর এক ধরনের জটিল অসুবিধে দেখা দিচ্ছে। মানুষ হল যন্ত্রের একবারে দ্বান্দ্বিক বিপরীত। 'সিস্টেম' হিসাবে বললে বলা যায়, মানুষ্য সিস্টেম ধীরগতির, সর্বদা সঙ্গতিময় নয়, কাজ করতে ভুল করে, কিন্তু সৃজনশীল। আর যন্ত্র হ'ল চটপটে, নির্ভুল, বিশ্বাসভাজন ও পুরোপুরি সৃজন-শক্তিরহিত। যন্ত্রগণক এত দ্রুত কাজ করে যে ডিজাইনার তার বিচারশক্তিকে 1800 গুণ দ্রুততর করতে বাধ্য হয়। আমরা দেখেছি, এর ফলে মানুষের সৃজনশীলতা প্রথম ঘণ্টায় 30% কমে, দ্বিতীয় ঘণ্টায় 80% কমে, আর তৃতীয় ঘন্টায় একেবারে লোপ পায়। মাথার কাজ করার লোকেদের এখন কর্মতৎপরতা (response time) মাপা হচ্ছে। বিভিন্ন জটিল মাথার কাজ তাদের দেওয়া হচ্ছে এবং তৎপরতা মাপা হচ্ছে। এ থেকে ওরা একটা আবিষ্কার—একটা আশ্চর্য্য আবিষ্কার—করেছে। সেটা হল, যত আপনি বুড়ো হবেন তত আপনার কর্মতৎপরতা কমে আসে। অবশ্য আমার ঠাকুমা-দিদিমাদের দেখে এ ব্যাপারটা আমি পাঁচ বছর বয়েস থেকেই জানতাম।

এই ধরনের হিসাব-নিকাশ ও তথ্যাদি সংগ্রহ করে ওরা বিভিন্ন কর্মীগোষ্ঠীর সবচেয়ে বেশী কাজ করবার বয়সসীমা নির্ণয়ে ব্রতী হয়েছিলো। দেখা গেল, গাণিতিকদের দক্ষতা সবচেয়ে বেশি হয় 24-25 বছর বয়সে, থিওরেটিক্যাল ফিজিসিস্টের ক্ষেত্রে এটি একটু বেশি, 26-27। এমনি করে বিভিন্ন পেশা অতিক্রম করে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারে এসে দেখা যায় এই বয়স 34। এরা বলছেন এই সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আমরা কয়েক বছর থাকি, তারপর আমাদের কর্মক্ষমতার হয় অবনতি। যে ব্যাপারটা আমি সবিশেষ উল্লেখ করতে চাই সেটা হল, এই ধরনের প্রযুক্তি-বিজ্ঞান শুধু শক্তি ও সম্পদকেই পুড়িয়ে নষ্ট করে তাই না, এ মানুষকেও শেষ করে দেয়। কোন মানুষের বয়স ও কর্মক্ষমতার 'গ্রাফ' মানব সভ্যতার কর্মোদ্যোতনার ইতিহাসের গ্রাফের মতনই। কায়িক শ্রমিকের কাজ করবার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি হয় বছর আঠারো মত বয়স থেকে এবং তা থাকে প্রায় বছর দশেক, তারপর তা কমে যায়। আধুনিক শিল্পে যারা কায়িক শ্রম করে তাদেরকে কি হারে কাজ করতে হয় সে হিসেবটা দেখলেই তাদের হালটা কি হয় বোঝা যাবে।……(আধুনিক শিল্প শুধু এভাবে মানুষের শরীরকেই শেষ করে দিচ্ছে তাই নয়,) এই শিল্পে আমরা সাংঘাতিক ভাবে মানুষের অবমূল্যায়ন ঘটাচ্ছি। উন্নত কম্পুটার সিস্টেমগুলির প্রসঙ্গে এখন বলা হচ্ছে, আমাদের আর মানবসত্তার কথা ভাবার দরকার নেই, আমাদের ভাবতে হবে মানব-দ্রব্যের কথা। এক অগ্রণী সিস্টেম ডিজাইনারের ভাষায় "আমরা যদি এভাবে মানব-দ্রব্যের উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ আনতে পারি যাতে করে একে ধাতব যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিক শক্তি বা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মতন ভাবা সম্ভব হয় তবেই আমরা মানব-দ্রব্যকে অন্য সমস্ত দ্রব্যের পর্যায়ে ফেলার লক্ষ্যে সফল হব। এবং তখনই এর সিস্টেম ডিজাইনের সমস্যাগুলি ভাবতে পারব। অবশ্য এই মানব-এককগুলি ব্যবহার করার অনেক অসুবিধা আছে। এরা কিছুটা ভঙ্গুর, সহজেই বাতিল হয়ে যায়, রোগগ্রস্ত হয়, এমনকি মারাও যায়। প্রায়ই এরা নির্বোধ, অনির্ভরযোগ্য এবং অত্যন্ত সীমিত স্মৃতিশক্তিবিশিষ্ট হয়ে থাকে। সর্বোপরি, এরা মাঝে মাঝে নিজেদের সার্কিট নিজেরাই বানানোর চেষ্টা করে, এবং সেটাই হল (সিস্টেম ডিজাইনের কোনো) দ্রব্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মারাত্মক দোষ। এদের ব্যবহার করবে যে সব সিস্টেম, তাদেরকে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।…"

শেষ যে তিনটি বিষয় আমি উল্লেখ করতে চাই তা বলছি। আমি যে সব সমস্যার কথা বলেছি তা যত খারাপের দিকে যাচ্ছে, সেগুলি সামাধানের জন্য তত বেশী করে প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হচ্ছে। একটি ফরাসী এয়ারোস্পেস কোম্পানীর একটি বৃহদায়তন বহুমুখী পরিকল্পনার অঙ্গ হ'ল 'পলায়ন-গুহা' বানানো। আপনারা যারা প্রকৃতি সম্পর্কে জানেন, তাঁরা জানবেন যে খরগোস খুব ভয় পেয়ে গেলে এইরকম গর্তে গিয়ে পালায়। সীল করার এবং শব্দ প্রতিরোধ করার সবচেয়ে উন্নত কারিগরী ব্যবহার করে এরা এই সম্পূর্ণ শব্দ-নিরোধক ক্যাপসুলটি বানিয়েছে। আপনার স্নায়ুবিকারের পর্যায়ের উপর নির্ভর করে মনোবিশেষজ্ঞ যেমন সঙ্গীত শুনতে পরামর্শ দিতে পারেন তেমনই আপনি এই একান্ত নিজস্ব কুঠুরীটিতেও নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলতে পারেন। অর্থাৎ আপনি সমাজের সমস্যাগুলির মুখোমুখি না হ'য়ে সেগুলি থেকে নিজেকে

সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলছেন। আমি শুনলাম এগুলি নাকি ফ্রান্সের স্নায়ুবৈকল্যবিশিষ্ট পদস্থ অফিসারদের কাছে শ'য়ে শ'য়ে বিক্রী হচ্ছে। এটা নাকি আবার পরিবহনযোগ্যও, যাতে করে এটিকে আপনি গ্রামের দিকেও নিয়ে যেতে পারেন। এবং তখন আপনাকে আর পাখী বা মৌমাছিরাও বিরক্ত করবে না…

পরবর্তী বিষয়টি এই ঃ আমাদের প্রযুক্তি পরিকল্পনার প্রথম পৃষ্ঠাতেই আরো বেশি বেশি করে মেয়েরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কাজে আসুক এই আশাটি, এই ইচ্ছাটি অভিব্যক্ত হয়েছে। আমরা একটা বিখ্যাত কম্পুটার জার্নালের বিগত 18 মাসের বিজ্ঞাপনগুলি খতিয়ে দেখেছি—শতকরা 82টি বিজ্ঞাপনে যন্ত্রের সাথে একটি করে লাস্যময়ী তরুণীর ছবি আছে—পুরুষের চোখে মেয়েদের ছবি। অন্যভাবে বলা যায়, পুরুষেরা মেয়েদের খেলনা মনে করে, যন্ত্রপাতি বিক্রীর মাধ্যম মনে করে। আমাদের পরিকল্পনার প্রথম পাতাতেই আমরা বলেছি, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিতে আরো বেশী সংখ্যক মহিলারা আসুন—পুরুষদের অনুকরণ ক'রে নয়, অথবা অবৈতনিক পুরুষ হিসেবে নয়, কারণ স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেওয়া

বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিতে যদি মহিলাদের অন্তর্দৃষ্টি, অন্তর্মুখীতা আর মানবিকতার বৈশিষ্ট্যগুলি ঢোকানো যায় তবে সেটা হবে একটা অবিশ্বাস্য মূল্যবান দর্শনগত অবদান।

কখনো সমতা আনতে পারে না। তাঁরা দেখান যে আমাদের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-প্রযুক্তি পুরুষ আধিপত্যবাদী দর্শনে পরিচালিত, যে দর্শন হ'ল শ্বেতকায়, পুরুষ, পুঁজিবাদী যোদ্ধার দর্শন। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিতে যদি মহিলাদের অন্তর্দৃষ্টি, অন্তর্মুখীতা আর মানবিকতার বৈশিষ্ট্যগুলি ঢোকানো যায় তবে সেটা হবে একটা অবিশ্বাস্য মূল্যবান দর্শনগত অবদান।

সবশেষে আমি বলতে চাই, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এমন কিছু নয় যা আগে থেকেই দেওয়া আছে। এটা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ-তারার মত কিছু নয়, এসব আমাদের মত লোকেরাই বানিয়েছে। আমরা যা চাই তা যদি এ দিতে না পারে তবে একে বদলাবার অধিকার আমাদের আছে, দায়িত্বও আছে। আরো বেশি বেশি করে আমাদের মাথায় ও মনে ঢোকানো হচ্ছে যে প্রযুক্তি বা টেকনোলজির সাথে আমাদের খাপ খাইয়ে চলতে হবে এবং অনেক সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে এটা ক্রমাগত করা হচ্ছে। বৃটেনে একটা বিখ্যাত বিজ্ঞাপন আছে যাতে টেকনোলজি একজন স্ত্রীলোককে কি করেছে তা দেখানো হয়। সে নার্ভাস টেনশনে ('high-rise blues') কষ্ট পায়। সেখানে সূক্ষ্মভাবে বলা হয়েছে যেহেতু সে তার পরিবেশকে বদলাতে পারে না (কেন পারবে না, সেটাই আমার প্রশ্ন), অতএব একটা শমক বা ট্র্যাংকুইলাইজার ট্যাবলেট খেয়ে তার মেজাজ (mood) পাল্টানো দরকার। আমাদের বড়ি বা ট্র্যাংকুলাইজার চাই না, চাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে কি আশা করি সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা, আর চাই এ বিষয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কার্যকরী কিছু করার সাহস। লিউকাস এয়ারোস্পেসের আমাদের এই পুরস্কার দিয়ে যে বিরাট সম্মান আপনারা দিলেন তার জন্য Right Livelyhood Foundation-কে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের ফাউণ্ডেশনের প্রত্যাশার যাতে আমরা উপযুক্ত হতে পারি তার চেষ্টা আমরা করব। যে জিনিসগুলো আমি আপনাদের এতক্ষণ দেখালাম তাদের উন্নয়নের জন্যে এই পুরস্কারের সমগ্র টাকাটাই আমরা ব্যয় করব।

এটা আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয়, "আপনি কি মনে করেন সাধারণ লোকেরা (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির) সমস্যাবলী নিয়ে কাজ করতে পারেন?" সারা জীবনে আমি একটাও সাধারণ লোক দেখিনি। যাদের দেখেছি তারা সবাই অসাধারণ। তাদের নানা রকম দক্ষতা, কর্মক্ষমতা, প্রতিভা আছে এবং তাদের সেই সব প্রতিভাকে খুব কমই উৎসাহ দেওয়া হয় বা বিকশিত হতে সাহায্য করা হয়। টেকনোলজির সোজা সড়কে চলতে চলতে আমাদের মনে রাখা উচিত, কলম্বাসের আবিষ্কারের আগে আমেরিকা যেমন ছিল, আমাদের ভবিষ্যৎ তেমনি সামনে কোথায়ও আছে, মোটেই এমন কিছু নয়। আমাদের ভবিষ্যতের পূর্বনির্দিষ্ট কোন আকৃতি বা অবয়ব নেই। আমার আপনার মত লোকেদের দ্বারাই এই ভবিষ্যৎ তৈরী হবে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বাছাইয়ের প্রকৃত সুযোগ আছে। ভবিষ্যৎটা এমন হতেই পারে যেখানে আমরা নিউক্লিয়ার অস্ত্র দ্বারা সার্বিক ধ্বংসের সম্মুখীন হব না অথবা ক্ষুধায় আর্তনাদ করব না। ভবিষ্যতে সত্যিই এমন পৃথিবী হতে পারে যেখানে সকল মানুষ মর্যাদা পাবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষকে ধ্বংস না করে তার প্রকৃত কল্যাণ করবে। এক কথায়, আমরা আধুনিক যুগের অলৌকিক কাজটি সম্পাদন শুরু করতে পারি—আমরা অন্ধকে দেখতে সাহায্য করতে পারি, পঙ্গুকে হাঁটাতে পারি এবং ক্ষুধিতকে অন্ন দিতে পারি। □

[**প্রগতিবার্তা** (কল্যাণী) পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত।
অনুবাদ ঃ **মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার**
সর্বত্র আক্ষরিক অনুবাদ সম্ভব হয় নি।]

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর
পুরনো সংখ্যার জন্য
লিখুন।

ঠিকানা ঃ
52/9c বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলকাতা-700012

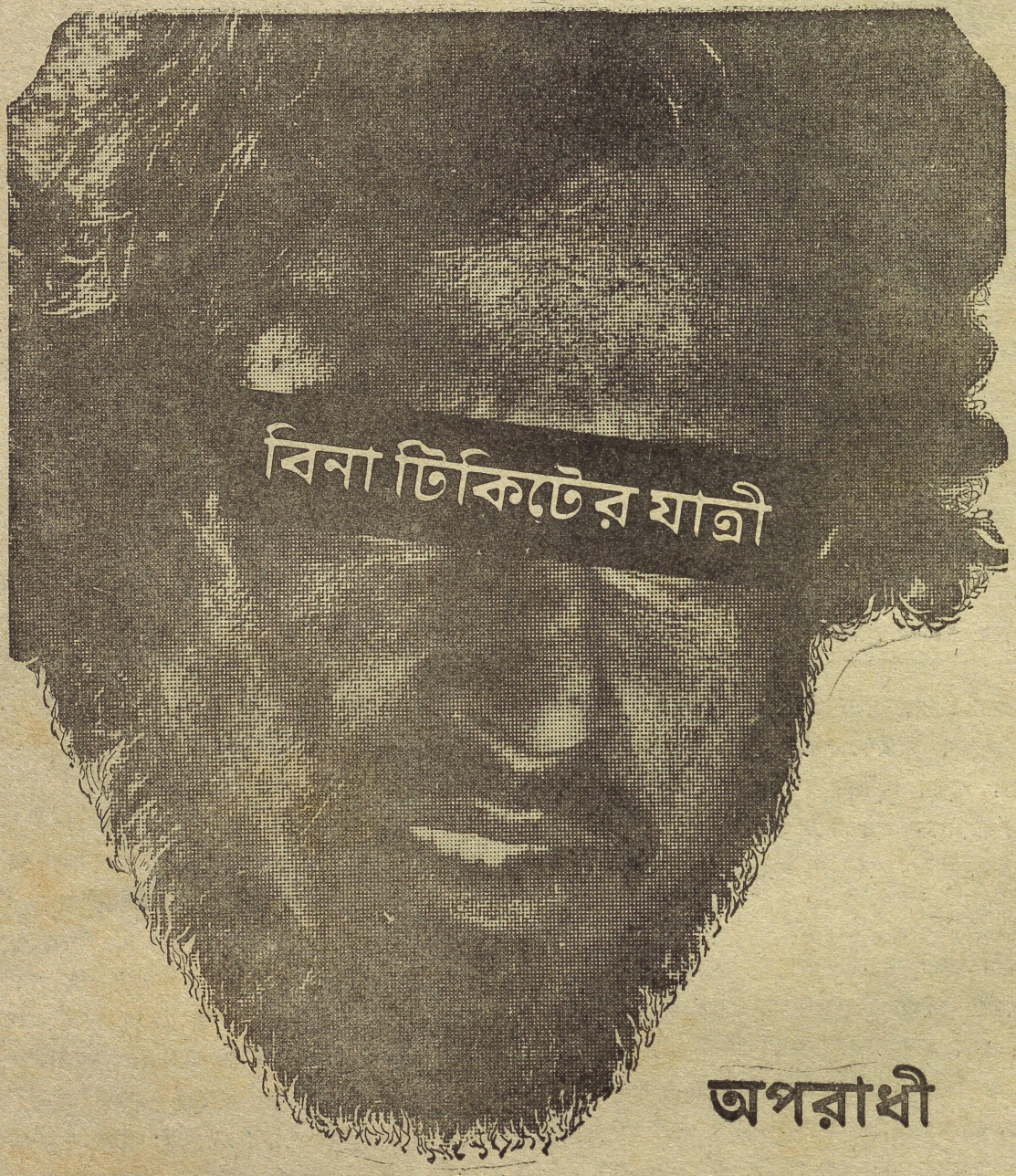

অপরাধী

S.E.RAILWAY

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

CONTAD/SER/9-85

মাইক কুলীর যে বক্তব্যটি প্রকাশিত হল এ সংখ্যায় তার পটভূমি বুঝতে সাহায্য করবে লুকাস কর্মীদের অভিনব আন্দোলনের এই সুপর্যালোচনাটি।

'লুকাস এয়ারোস্পেস' নতুন অভিজ্ঞতা নতুন সম্ভাবনা

সুরঞ্জন কর

ষাটের দশকের শেষ থেকেই ব্রিটেনে নতুন করে এক শিল্প অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। দুনিয়াজোড়া তেল সংকট, অটোমেশন, এবং কিছু বহুজাতিক সংস্থার ব্রিটেন থেকে ব্যবসা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নীতি এক গভীর সংকটের জন্ম দেয়। উৎপাদন পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তনের ফলে দক্ষ শ্রমিকরা হারাচ্ছিল তাদের স্কিলড্ স্ট্যাটাস, অদক্ষ শ্রমিকেরা হারাচ্ছিল কাজ। শিল্প কাঠামোর চেহারাটাই বদলে যেতে শুরু করে দ্রুত গতিতে। এই পরিস্থিতিতে প্রথাগত ট্রেড ইউনিয়ন ক্রমাগতই নতুন সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হচ্ছিল। এই রকম সময় প্রথম প্রতিবাদ আসে লুকাস এয়ারোস্পেস শ্রমিকদের কাছ থেকে। লুকাস এয়ারোস্পেস লিমিটেড হল ব্রিটেনে অবস্থিত এক বহুজাতিক সংস্থা লুকাস ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের এক শাখার নাম। এঁর অটোমোবাইল, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প ও বায়ুযান শিল্পের জন্য নানা ধরনের সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশ তৈরী করায় পারদর্শী এক সংস্থা হিসাবে পরিচিত। ঢালাও উৎপাদনের বদলে এঁরা ঝোঁক দেন অল্প কিন্তু নিখুঁত উৎপাদনের দিকে। বিশেষতঃ বায়ুযান শিল্পের ক্ষেত্রে এটা জরুরীও বটে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, লুকাস এয়া-রোস্পেসের উৎপাদনের প্রায় 50 ভাগই হত সামরিক বিভাগের প্রয়োজন মেটানর জন্য। এই পটভূমিকায় লুকাস শ্রমিকরা সামাজিক ভাবে উপযোগী জিনিসপত্র উৎপাদনের জন্য শুরু করেন এক সংগ্রাম। উৎপাদনের উপর শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ কায়েমের লক্ষ্যে চালিত আন্দোলনে সামিল হয়ে তাঁরা ঠিক করেন উৎপাদনের কয়েকটি সামাজিক মাপকাঠি। যেমন—যে কোন উৎপাদন শুধু কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তির চাহিদা মেটানোর জন্য নয় বরং কম্যুনিটির সমস্ত মানুষের কাছে উপযোগী ও লভ্য হতে হবে। বর্তমান দক্ষতার সম্পূর্ণ ব্যবহার ও কম্যুনিটির স্বার্থে তার আরও অগ্রগতির লক্ষ্যে উৎপাদনকে পরিচালিত করতে হবে। উৎপাদনের প্রকৃতি শ্রমিকদের ও কম্যুনিটির স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার কোন ক্ষতি যেন না করে। উৎপাদনের প্রকৃতি এমন হতে হবে যাতে প্রাকৃতিক সম্পদের সম্ভাব্য ন্যূনতম ব্যবহার হয় ও পরিবেশের উন্নতি সাধিত হয়।

এই দাবীগুলিকে বাস্তবে পরিণত করার উদ্দেশ্যে '68 সালে লুকাস এয়ারোস্পেসের শপ-স্টুয়ার্ডরা তৈরী করেন লুকাস এয়ারোস্পেস কম্বাইন শপ স্টুয়ার্ডস্ কমিটি (এল·এ এস·এস·সি) এবং এর মাধ্যমে তাঁরা লুকাসের সতেরোটা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করেন। ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনে এটা ছিল একটা নতুন পদক্ষেপ। এই প্রথম উচ্চস্তরের প্রযুক্তিবিদ থেকে শপ ফ্লোরের অদক্ষ শ্রমিক পর্যন্ত মজুরী আর পরিবেশকে একই দাবীর অন্তর্ভুক্ত করলেন। এই ঘটনা এটাও প্রমাণ করছিল যে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রথাগত ট্রেড ইউনিয়নগুলির ব্যর্থতা সম্পর্কে শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। '74 সালে "কম্বাইন" নতুন প্রযুক্তি সংক্রান্ত সমস্যাগুলির মোকাবিলায় একটি "সায়েন্স এ্যাণ্ড টেকনোলজি অ্যাডভাইসারি সার্ভিস" চালু করে এবং দক্ষতার ক্ষতি, কাজের চাপ বৃদ্ধি ও নতুন নতুন বিপদ সম্পর্কে পূর্বাভাস পাওয়ার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হয়। কিন্তু পরিস্থিতি দ্রুত খারাপের দিকে যেতে থাকে। '73-'74 সালের তেলের দাম বাড়া এবং একই সাথে লুকাস কর্তৃপক্ষের 4000 কর্মী ছাঁটাইয়ের নতুন পরিকল্পনা শ্রমিকদেরকে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু অর্থনৈতিক কাঠামোর তথা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে বিশাল পরিবর্তন হচ্ছিল তার অনেকটাই প্রথাসিদ্ধ ট্রেড ইউনিয়নের চিন্তাভাবনার বাইরে ছিল। "কম্বাইন" চেষ্টা শুরু করে এই দিকগুলিতে অনুসন্ধান চালাবার। এবং সমাজে প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে চারটি বড় মাপের অসঙ্গতির দিক খুঁজে বের করার। প্রথম অসঙ্গতি, প্রযুক্তি সামাজিক স্বার্থে যা করতে পারে আর বাস্তবে যা করছে তার মধ্যে। যথা "কন্‌কর্ড" বিমান তৈরীর প্রযুক্তি আবিস্কার হয়ে গেছে অথচ ডায়ালিসিস মেশিন তৈরীর ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে, যা নাকি শুধু ব্রিটেনেই প্রত্যেক বছর 3000 রোগীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারত। দ্বিতীয়তঃ একদিকে বলা হচ্ছে, যথেষ্ট উৎপাদন হচ্ছে না, অত্যাবশকীয় সংস্থায় সেবার মান পড়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে পনের লক্ষ লোককে তাদের দক্ষতা, উৎসাহ ও নিজস্বতার সৃষ্টিশীল প্রকাশ থেকে ব্যাহত করা হচ্ছে। তৃতীয় অসঙ্গতি, যা মাইক কুলীর কথা থেকে বেরিয়ে আসে, তা হল, "কম্পুটারাইজেশন, অটোমেশন এবং রোবটের ব্যবহার মানুষকে আপনা থেকে পিঠ-নুইয়ে-দেওয়া আত্মা-পঙ্গু-করে-দেওয়া কাজ থেকে রেহাই দেবে এবং তাকে আরো সৃজনশীল কাজে নিযুক্ত করবে এ এক অতিকথন (myth) ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার সদস্যদের এবং শিল্পায়িত দেশগুলির লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের ধারণা হল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আসলে এর উল্টোটাই ঘটে।" চতুর্থ অসঙ্গতি কম্বাইন লক্ষ্য করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপব্যবহারের ক্ষেত্রে জনসাধারণের বিরোধিতার মধ্যে। এক্ষেত্রে দোষ দেওয়া হয় ব্যক্তি হিসেবে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার থেকে শ্রমের অমানবিক ব্যবহার পর্যন্ত যাঁরা আসলে দায়ী অর্থাৎ যাঁরা বিজ্ঞানী বা প্রযুক্তিবিদদের নিয়োগ কর্তা, সেই নীতিনির্ধারণকারীরা পর্দার আড়ালে থেকে যান। দোষ তাঁদের ওপর পড়ে না।

এই সমস্ত অসঙ্গতি পর্যালোচনার মাধ্যমে ও আগামী দিনের শ্রমিক বাড়তি হবার সম্ভাবনার সামনে দাঁড়িয়ে "কম্বাইন" বুঝতে পারে যে শিল্পের এই ভয়াবহ সমস্যার সাথে যুঝতে গেলে প্রথাসিদ্ধ ট্রেডইউনিয়নের বাঁধাধরা পথের বাইরে বেরোতে হবে। '74 সালের নভেম্বর মাসে শ্রমিক দলের সরকারের শিল্পমন্ত্রী টনি বেন, কম্বাইন কমিটির সাথে মিলিত হন এবং কারখানা শিল্পে মন্দার ক্ষেত্রে বিকল্প উৎপাদনের কথা ভাবতে রাজী হন। "কম্বাইন" এই অবস্থায় সিদ্ধান্ত নেয় লুকাস এয়ারোস্পেসের বিকল্প প্রযুক্তিগত অগ্রগতির জন্য এক যৌথ পরিকল্পনা (Corporate Plan) প্রস্তুত করার। পনের মাস ধরে শপ স্টুয়ার্ড, টেকনিশিয়ান, বিজ্ঞানী এবং প্রোডাকশন শ্রমিকরা তাঁদের গোটা অবসর সময়টাই এই কাজে লাগান। প্রাথমিক ভাবে "কম্বাইন" 180টি বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্‌স্টিটিউট ও অন্যান্য সংস্থার কাছে ধারণার জন্য সাহায্য চায়। কিন্তু এ ব্যাপারে খুব সামান্যই সাহায্য পাওয়া যায়। যাই হোক, "কম্বাইন" কর্মীরা তাঁদের প্রয়াস নিরলস ভাবে চালিয়ে যান। লুকাসের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানেই এ ব্যাপারে অদক্ষ শ্রমিক থেকে বিজ্ঞানী সবার মধ্যেই ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। এই সময়েই তাঁরা নিজেদের পত্রিকা "কম্বাইন নিউজ" বের করা শুরু করেন। '75 সালের শেষ দিক থেকে সমস্ত পরিকল্পনাগুলি জমা পড়তে থাকে। জানুয়ারী '76 এ এগুলি চূড়ান্ত রূপ পায়। 6টি দলিল, প্রত্যেকটি 200 পাতার, মোট 150 ধরনের উৎপাদনের প্রযুক্তিগত তথা অর্থনৈতিক তথ্যগুলি তুলে ধরে। সামাজিক-ভাবে উপযোগী উৎপাদনের জন্য "কম্বাইন" প্রচার অভিযানের ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা হয়ে ওঠে প্রধান হাতিয়ার।

উৎপাদনগুলির মধ্যে ছিল হাইড্রোজেন জ্বালানীর ব্যাটারী, হীট পাম্প, সৌর শক্তি সংগ্রাহক, এবং ছোট বায়ু-চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদক যা কম্যুনিটির চাহিদা মেটানর পক্ষে উপযোগী। লুকাস ইতিমধ্যেই ডায়ালিসিস মেশিন ও পেস্‌মেকার উৎপাদন শুরু করেছিল। প্রস্তাব দেওয়া হয় এই উৎদাপন বাড়ানর এবং একই সাথে করোনারী রোগীদের জন্য জীবনদায়ী এবং অন্ধদের যান্ত্রিক দৃষ্টিদায়ক ব্যবস্থার উৎপাদন শুরু করার। মেরুদণ্ডের রোগে আক্রান্ত শিশুদের জন্য এক গাড়ীর (ববকার্ট) ডিজাইন করে উলভার হ্যাম্পটনের শ্রমিকরা সবার প্রশংসা কুড়োন। এছাড়া আগুন নিরোধক তথা গভীর সমুদ্রের ডুবুরীদের পেশাকের পরিকল্পনাও "কম্বাইন" দেয়। পরিবহণ নিয়ে যাঁরা কাজ করছিলেন তাঁরা জ্বালানী সাশ্রয় করে, বিষাক্ত ধোঁয়া নির্গমন কমায় এবং শব্দ দূষণ রোধ করে এরকম গাড়ীর পরিকল্পনা তৈরী করেন। প্রথাগত ট্রেনের পরিবর্তে এমন এক "রেল-রোড" গাড়ীর পরিকল্পনা দেওয়া হয় যার ক্ষেত্রে ব্যাপক খরচার রেল লাইন পাতা দরকার হবে না।

'76 সালে যখন পরিকল্পনাগুলি প্রকাশ হয় তখন শুধু ব্রিটেনেই নয় ফ্রান্স, সুইডেন, পশ্চিম জার্মানীতে ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। গার্ডিয়ান, নিউ সাইন্‌টিস্টের মত পত্র-পত্রিকায় একে ব্রিটিশ প্রযুক্তির ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসাবে দেখান হয়।

এখানে বলা দরকার যে শ্রমিকরা যৌথভাবে তাঁদের কাজের দায়িত্ব নিতে তৈরী ছিলেন কিন্তু কোম্পানীকে নিজেদের হাতে নিয়ে নিতে বা তাকে শ্রমিকদের সমবায়ে পরিণত করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁরা দেখাতে চাইছিলেন যে যা মানবিক সমস্যা দূর করে এমন উৎপাদন করতে তাঁরা তৈরী, যা সমস্যা বাড়ায় তা নয়। কম্বাইন জানত যে লুকাস কর্তৃপক্ষ রাতারাতি নিজেদের ক্ষেত্র থেকে সরে এসে বিকল্প উৎপাদনের দিকে ঝুঁকবে না। তাই তাঁরা আস্তে আস্তে উৎপাদনের প্রকৃতি পরিবর্তনের দিকে জোর দেন।

'76 সালের এপ্রিলে কর্তৃপক্ষ তাঁদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কোন সময়েই কর্তৃপক্ষ "কম্বাইন" কে শ্রমিকদের বৈধ প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি দেয় নি)। কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনাগুলিকে পুরোপুরি নাকচ করে দেয় এবং "কম্বাইনের" সাথে কথা বলতে অস্বীকার করে। এটা ছিল কম্বাইনের" কাছে একটা রূঢ় আঘাত। এমন কি দি ইকনমিস্ট বা নিউ সাইন্‌টিস্টের মত পত্রিকাও তাদের বিস্ময় প্রকাশ করে। তবুও এই পর্যায়ে "কম্বাইন" তাদের পরিকল্পনাগুলিকে গ্রহণ করানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু সরকারী শিল্পদপ্তর এবং ট্রেড ইউনিয়ন উভয়েই এ ব্যাপারে "কম্বাইন" কে প্রায় কোন সাহায্যই করে না। এরই মধ্যে '78 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নর্থ ইস্ট লণ্ডন পলিটেকনিকের সাথে যৌথভাবে কম্বাইন তৈরী করে একটি প্রতিষ্ঠান—সেণ্টার ফর অলটারনেটিভ ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এ্যাণ্ড টেকনোলজিকাল সিস্টেমস্, ('ক্যাইটস')। এখানে শ্রমিকদের তৈরি যৌথ পরিকল্পনার তত্ত্বগত অগ্রগতির উদ্দেশ্যে কাজ চালান হতে থাকে। এবং ক্রমে "ক্যাইটস" স্থানি সমবায় তথা শ্রমিকদের তৈরী পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রধান তথ্য-কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই সংক্রান্ত খবরাখবরের জন্য অনুরোধ আসতে থাকে অষ্ট্রেলিয়া বা চীনের মত দূর দেশ থেকে। জাতীয় পর্যায়ে 'ক্যাইটস' যোগাযোগ রেখে চলছিল শ্রমিক আন্দোলন থেকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ—সবার সাথে।

'78 মার্চ ছিল কম্বাইনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সময়। লিভারপুল, ব্র্যাডফোর্ড ও কভেণ্ট্রির কারখানাগুলিতে লুকাস ক্লোজার ঘোষণা করে। প্রায় 2000 শ্রমিকের কাজ যায়। এ ব্যাপারে "কম্বাইন" কর্তৃপক্ষের স্বীকৃত ইউনিয়নের সাথে যৌথভাবে আন্দোলন শুরু করে। '79র জানুয়ারীতে একটি যৌথ পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়। এতে ব্রিটেন থেকে ইটালী, জার্মানী ও ফ্রান্সে কারখানা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষর চেষ্টার তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং সরকারী শ্রম দপ্তর ও লুকাস কর্তৃপক্ষর অশুভ আঁতাতের কথাও ঘোষিত হয়। দেখান হয় যে 200 মিলিয়ন পউণ্ড লাভ স্বত্ত্বেও কিভাবে লুকাস কর্তৃপক্ষ

কর্মসংস্থান নষ্ট করছে। রিপোর্টের বাকি অংশে কি ভাবে বিকল্প উৎপাদনের সাহায্যে ওই 2000 শ্রমিকের কর্মসংস্থান হতে পারে তার বিস্তৃত পরিকল্পনা দেওয়া হয়। এর মধ্যে ছিল ডায়ালিসিস মেশিন তৈরী করার তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা এবং 18 থেকে 24 মাসের মধ্যে গ্যাস টারবাইন, পাম্প, ইত্যাদী তৈরীর কথা।

তীব্র আন্দোলনের মুখোমুখি হয়ে এই পর্যায়ে কতৃপক্ষ বাধ্য হয় ইউনিয়নের সাথে সমঝোতা করতে। দু বছরের জন্য লিভারপুল ও ব্র্যাডফোর্ডের ছাঁটাই বন্ধ করা সম্ভব হয়, কিন্তু এসব সত্ত্বেও কতৃপক্ষ তাদের "কম্বাইন"-বিরোধিতা বন্ধ করে নি। বস্তুতঃ কম্বাইনের সামনে রয়েছে প্রযুক্তির কাঠামোকে মানবিক করে তোলার কঠিন চ্যালেঞ্জ। কম্বাইনের এই অভিনব প্রচেষ্টা জনমানসে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। কম্বাইন দেখিয়েছে যে প্রতিভা কিছু বাছাই করা মানুষের একচেটিয়া নয়, এটা আসলে শ্রমজীবী মানুষের যৌথ প্রয়াসের বহিঃপ্রকাশ। এই দৃষ্টান্ত তাই উৎসাহিত করে তুলেছে অন্য শিল্পের শ্রমিকদেরও। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে '76 সালের সেপ্টেম্বরে যখন ম্যাঞ্চেষ্টারে অবস্থিত স্ক্র্যাগ কোম্পানীর দুটি টেক্সটাইল কারখানায় ক্লোজার ঘোষণা করা হয় তখন সেখানকার শ্রমিকরা লুকাস কম্বাইনের পথ অনুসরণ করে বিকল্প উৎপাদনের জন্য এক যৌথ পরিকল্পনা হাজির করেন। বস্তুত শুধু জাতীয় ক্ষেত্রে নয়, যেহেতু বহুজাতিক সংস্থার বিচরণভূমি গোটা পৃথিবী, তাই লুকাস কম্বাইনের এই আন্দোলনের মধ্যে আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রেও প্রতিরোধের ইঙ্গিত রয়েছে। আগামী দিনে তা হয়ত আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সূত্র ঃ সাইন্স অর সোসাইটি মাইক হেলস্ (প্যান বুক্স)
স্মল ইজ্ পসিবল—জজ ম্যাক রবি
(বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীতে পাওয়া যাবে)। □

DICTIONARIES

From Oxford

Oxford Dictionary of Current Idiomatic English Volume 1	£ 7.95
Oxford Dictionary of Current Idiomatic English Volume 2	£12.50
The Oxford Illustrated Dictionary	£12.95
Oxford Universal Dictionary	Rs.130
Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English	£ 7.95
The Concise Oxford Dictionary	Rs. 65
The Oxford-Dudden Pictorial English Dictionary	Rs. 75
The Oxford Senior Dictionary	Rs. 35
The Oxford Dictionary of Quotations	Rs.275
The Concise Oxford Dictionary of Quotations	Rs. 50
The Oxford Minidictionary of Quotations	£ 1.95
BBC Pronouncing Dictionary of British Names	£ 6.95
The Oxford Russian-English Dictionary	£28.50
A Concise Dictionary of Law	Rs.150
Dictionary of Computing	Rs.220

OXFORD UNIVERSITY PRESS
Faraday House
P-17 Mission Row Extn., Calcutta 13

একটি প্রচার অভিযানের নাম

ডার্টি ডজন

কীটনাশক ব্যবহারের ফলে খাদ্যোৎপাদন বেড়েছে এ কথা মিথ্যা নয়। তবে ক্ষতির কথা কেউ বলেন না। পেস্টিসাইড ব্যবহারের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে বহু অজানা দিক থেকে বিপদ আসছে—যা আগে অনুমান করা যায়নি।—ক্রমে প্রকাশ পাচ্ছে। এ সম্পর্কে আমাদের অবহিত থাকা প্রয়োজন।

কীটনাশক সংক্রান্ত এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছে Pesticide Action Network বা সংক্ষেপে PAN। সম্প্রতি এরা একটি প্রচার অভিযান শুরু করেছেন। নাম—Dirty Dozen Campaign—শুরু হয়েছে গত 5ই জুন '85, বিশ্ব পরিবেশ দিবসে।

"ডার্টি ডজন" বা "এক ডজন আবর্জনা" বলতে বারোটি কুখ্যাত পেস্টিসাইডের কথা বলা হচ্ছে। এর মধ্যে আছে—এলড্রিন, ডাই-এলড্রিন, ডি-ডি-টি, এনড্রিন ইত্যাদি রাসায়নিক। তৈরী করে বায়ার, হেক্সট, এইসব দানবাকৃতির কোম্পানী। এই এক ডজন রাসায়নিক ব্যবহারোপযোগী নয় বলে চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু বন্ধ হয়নি এদের ব্যবহার। কিছু কিছু উন্নত দেশে ব্যবহার নিষিদ্ধ হলেও অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশে রপ্তানি বন্ধ হয়নি। ফলে পাচার হচ্ছে সেই সমস্ত দেশে, যেখানে বিধি-নিষেধের বেড়া তেমন পোক্ত নয় এবং মানুষ এর বিপদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। এই অভাব পূরণের লক্ষ্য নিয়েই গড়ে উঠেছে PAN International। যুক্ত হয়েছে আফ্রিকা, এশিয়া, লাতিন আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের বহু সংস্থা।

"বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী" এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছে এবং সীমিত ক্ষমতায় এই ধরনের সমস্ত প্রচারের কাজে সহায়তার আশ্বাস রাখছে। আমরা প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করব এবং 'বি-ও-বি'র পাতায় প্রকাশ করব। আপনাদের সকলের কাছে আবেদন—আপনারাও ব্যক্তিগতভাবে বা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার মাধ্যমে অথবা শ্রমিক ও কৃষক সভার মাধ্যমে এই ধরনের প্রচারে সহায়তা করুন। আপনারাও লিখুন আপনাদের মুখপাত্র।

এই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা পত্র-পত্রিকা গোষ্ঠী এই উদ্যোগে সামিল হতে পারেন সহজে। এ বিষয়ে লেখা ছাপুন—পোস্টার তৈরী করুন। ইচ্ছে করলে 'বি-ও-বি'র পাতার তথ্যগুলিই বিনা দ্বিধায় ছাপুন। দরকার মনে হলে আমাদের লিখে জানান—আনুষঙ্গিক তথ্য সরবরাহের চেষ্টা করব। চাইলে আমাদের সংগৃহীত তথ্যপত্রের জেরক্স কপি করে পাঠাবো।—তবে তার খরচটুকু চাইব।

চাইলে আপনারা PAN International এর সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন। এদের এশিয়া বিভাগের ঠিকানা—International Organisation of Consumers Unions, PO Box 1045, Penang, Malaysia।

মনে রাখা দরকার যত বেশী লোক এই সমস্ত তথ্য সম্পর্কে অনবহিত থাকবে ততই গুটিকয়েক গোষ্ঠী বা কোম্পানীর লাভ। এই ধরুন না—আমাদের দেশের কথা। বেশীর ভাগ মানুষ এসব বিপদের খবর রাখেন না—তাই বিষ-ব্যবসার এমন বোলবোলা। মানুষ এই বিষ ব্যবহারের কথা জানতেন না। তাদের জানানো হয়েছে। এখন বিপদের কথা জানাতে হবে। এবং তা সম্ভব।

আসুন আমরা সকলে এই উদ্যোগে সামিল হই। আমাদের তথ্য সংগ্রহের কাজে সাহায্য করুন। আপনার জানা কোন পেস্টিসাইড দুর্ঘটনার কথা জানা থাকলে আমাদের জানান। বিশেষ কোন পেস্টিসাইডের কোন ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে আপনার পর্যবেক্ষণ থাকলে জানান।—এইভাবে গড়ে তুলি তথ্যভাণ্ডার, যা আমাদের প্রচার অভিযানে সাহায্য করবে।

সঃ মঃ/বি-ও-বি

মিনামাতা

পার্থ সেন

ভূপালের সেই কালো রাত্রি যাদের গ্রাস করেছে, আর সে রাতের—আজকের এ যুগের—অভিশাপ ঝেড়ে ফেলে যারা বাঁচার লড়াইয়ে নেমেছে তাদের কাছে, আমাদের সকলের কাছে মিনামাতার ইতিহাস পর্যালোচনা খুব জরুরী।

"দশ বছর আগে স্টকহম্-এ যেমন আপনাদের সামনে হাজির হয়েছিলাম, ঠিক তেমনি আজ নাইরোবিতে এসেছি এই কথা বলতে যে আমার মত আর কেউ যেন বিকলাঙ্গ হয়ে না পড়ে, আমার মত আর কেউ যেন স্বজন-হারানো শ্মশানে বাস না করে। আমি কেন, আপনারাও নিশ্চয়ই চাইবেন না মানুষকে বলি দিয়ে গড়ে উঠুক বিষ ছড়ানোর কল-কারখানা।" 1982 সালে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলনে কথা ক'টি বলেছিলেন মিনামাতা রোগগ্রস্ত পঙ্গু সুগিনারি হামামাতো। 30 বছর আগের মিনামাতার বিভীষিকার পর ঘটে গেল ভূপালের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। হাজার হাজার লোক প্রাণ হারাল, বহু লোক গৃহহারা হ'ল, অনেকের পরিবার পরিজন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সারা জীবনের মত পঙ্গু হয়ে গেল কেউ, অনেক শিশুই ভূমিষ্ঠ হল বিকলাঙ্গ হয়ে। ইটালীর সেভাসোয়, কানাডায়, সুইডেনে, থ্রী মাইল আইল্যান্ডে, দূষণে আক্রান্ত হয়েছে মানুষ। তবু হামামাতোর সতর্কবাণী শুধু আবেদন হিসেবেই থেকে গেছে।

1984-র ডিসেম্বরের কালো রাত্রির কথা স্মরণ করে প্রায় 30 বছর আগের জাপানের মিনামাতা উপসাগরের দূষণ ও সেখানকার মানুষের সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করছি। ভূপালের মানুষ ও তাদের সাথী যাঁরা সংগ্রামে লিপ্ত আছেন, তাঁদের কাছে মিনামাতার এই অভিজ্ঞতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইউনিয়ন কার্বাইড-এর পরিচালকমণ্ডলী এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও মধ্যপ্রদেশ সরকারের উদ্যোগে যেমন করে আড়াল করা হয়েছে প্রকৃত ঘটনা ও অপরাধীদেরকে, যেমন করে আক্রান্ত ও মৃতদের পরিবারবর্গকে ঠকানোর চেষ্টা হচ্ছে, যেমন করে গোপন করা হচ্ছে প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য, ঠিক সেরকমই ঘটেছিল মিনামাতার ক্ষেত্রেও। এত প্রতিকূল অবস্থায়ও মিনামাতার দূষণ-বিরোধী সংগঠন যে সংগ্রাম দীর্ঘ 30 বছর ধরে পরিচালনা করছে, যেমন করে তথ্য উদ্‌ঘাটনের কাজ করেছে তা সত্যিই অসাধারণ।

মিনামাতার ইতিহাস ঃ 1907 সালে জাপানের মিনামাতা উপসাগরের কাছে মিনামাতা শহরে চিজো কর্পোরেশন নামক ফ্যাক্টরিটি স্থাপিত হয়। 1932 সাল থেকে এই কারখানায় এসিটালডিহাইড তৈরী করা হয় এবং কারখানার রাসায়নিক জঞ্জাল উপসাগরে ফেলা হতে থাকে। 1950 সালে মিনামাতা সাগরের উপকূলে প্রচুর মাছ মরে ভেসে ওঠে। এই সময় মিনামাতার বিড়ালদের মধ্যে এক ধরনের অদ্ভুত রোগ দেখা যায় যাকে 'নাচিয়ে রোগ' ('Dancing Disease') নাম দেওয়া হয়। লক্ষ্য করা যায়, বহু বিড়াল ভূতে পাওয়ার মত করে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। অঞ্চলের বিড়ালদের একটা বড় অংশই এভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। 1956 সালের এপ্রিল মাসে প্রথম 6 বছরের একটি শিশু আক্রান্ত হয়ে চিজো কারখানার হাসপাতালে ভর্তি হয়[1]। ঐ বছরেই এলাকার বহু লোক রোগাক্রান্ত হয় ও রোগ মহামারীর আকার ধারণ করে। অনুসন্ধানের ফলে জানা যায়, 1953 সাল থেকেই মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হতে শুরু করেছিল। হাসপাতাল অধিকর্তা, ডাক্তার হাজিমে হোসোকায়ো তার রিপোর্টে এই রোগের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন "কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের এক বিশেষ রোগ মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছে।" তখন থেকেই একে মিনামাতা রোগ আখ্যা দেওয়া হয়। রোগের সমস্ত উপসর্গই আক্রান্ত বিড়ালদের উপসর্গের সাথে মিলে যায়। 'হাত-পায়ের দুর্বলতা ও অসাড়তা, হাত পা মুখের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা, বেশীক্ষণ কোন কিছু ধরে রাখতে এবং দাঁড়িয়ে থাকতে না পারা এই রোগের বিশেষ উপসর্গগুলোর অন্যতম। এ ছাড়াও আছে কথা বলায় বিকৃতি, মাথা ধরা, শ্রবণশক্তি এবং স্মৃতিশক্তি বিনষ্ট হওয়া। যারা বেশী পরিমাণে আক্রান্ত, তাদের হাত পা বিকৃত হয়ে যায়, পেশীতে অস্বাভাবিক খিঁচুনি ধরে, দৃষ্টিশক্তিও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের ফলে দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা সকলেই মারাত্মক স্নায়ু-রোগের শিকার হয়েছে[2]।

কুমামোটো বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুলের 'মিনামাতা ডিজিস রিসার্চ গ্রুপ' 1956 সালের আগস্ট মাসে সন্দেহ প্রকাশ করে যে এই রোগের সাথে কোন ভারী ধাতুর বিষক্রিয়া যুক্ত। এই বিষক্রিয়া

সম্ভবতঃ মিনামাতা উপসাগরের মাছ থেকে মানুষের শরীরে প্রবেশ করেছে। 1957 সালে 52 জন আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে 21 জনই মারা যায়। মিনামাতার মাছ বিক্রী নিষিদ্ধ হয়, কিন্তু মাছ ধরা বন্ধ হয় না। 1959 সালে কুমামোটো বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ গ্রুপ একে মিথাইল মারকারির বিষক্রিয়া বলে চিহ্নিত করে এবং 1958 সালে পরিলক্ষিত ব্রাসেলসের মিথাইল মারকারি কারখানার শ্রমিকদের রোগের উপসর্গের সঙ্গে মিনামাতা রোগের মিল খুঁজে পাওয়া যায়[3]। অবশেষে এই রিসার্চ গ্রুপের ডঃ উচিদা মাছ থেকে মিথাইল মারকারি যৌগের (CH_3HgSCH) কেলাস পৃথক করে মারকারি দূষণ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করেন[4]। 1962 সালে ডঃ ইরুকায়ামা অ্যাসিটালডিহাইড ফ্যাক্টরির বর্জিতাংশে মিথাইল মারকারি ক্লোরাইড সনাক্ত করেন[5]। এর পর থেকেই চিজো কোম্পানী তাদের হাসপাতালের পর্যবেক্ষণ ও দূষণ গবেষণার উপর নিয়ন্ত্রণ কঠোরতর করেন। এই সময়ে সরকারীভাবে স্বীকৃত 121 জন আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে 46 জনই মারা যায়।

আক্রান্ত ব্যক্তিদের দেহের বিভিন্ন অংশে পারদের ঘনত্ব স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশী মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। 1961 সালে দেখা যায় মিনামাতা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের যকৃতে 22 থেকে 70.5 পি. পি. এম (10 লক্ষ ভাগের 1 ভাগ), বৃক্কে 21.2 থেকে 140 পি. পি. এম, মস্তিষ্কে 2.6 থেকে 24.8 পি. পি. এম পারদ সঞ্চিত হয়েছে[6]। মাথার চুলে সর্বোচ্চ পারদমাত্রা আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা গেছে 705 পি. পি. এম, যখন ঐ অঞ্চলের সুস্থ ব্যক্তিদের চুলের মধ্যে সর্বোচ্চ পারদমাত্রা ছিল 191 পি. পি. এম[7]। মিনামাতা রোগের পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেছে যে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দেহে 100 মিলিগ্রাম মিথাইল মারকারি সঞ্চিত হলেই বিষক্রিয়া প্রকট হয়। সঞ্চিত মিথাইল মারকারির পরিমাণ প্রতি 51 কে. জি দেহের ওজনে 150 মিলিগ্রাম হলে মিনামাতা রোগের লক্ষণ ফুটে ওঠে। চুলে মিথাইল মারকারির পরিমাণ 50 মিলিগ্রামের বেশী অথবা রক্তে এই যৌগের পরিমাণ 2 পি. পি. এম-এর বেশী হলেও মিনামাতা রোগের উপসর্গ দেখা যাবে[8]।

জাপানে মাছেদের মধ্যে যে পরিমাণ বিষক্রিয়া হয়েছিল তাতে 200/300 গ্রামের বেশী মাছ খেলে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা ছিল প্রবল। অবশ্য এই বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোন 'সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা' নির্দ্ধারণ করা যায় কিনা সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। দীর্ঘকাল ধরে অতি স্বল্পমাত্রায়ও যদি মিথাইল মারকারি সঞ্চিত হতে থাকে তবু এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে প্রবল।

ভ্রূণ অবস্থায় মারকারি দূষণের ফলে শিশুরা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ও স্নায়ুরোগের শিকার হয়। মিনামাতা অঞ্চলে অসাড় মস্তিষ্ক সম্পন্ন শিশু জন্মের হার শতকরা 6·4 ভাগ, যেখানে স্বাভাবিক অবস্থায় এই হার শতকরা 0·2 থেকে 0·3 ভাগ। এই অঞ্চলে জড়বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুর সংখ্যা শতকরা 29 জন। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী জাপানে শিশুদের জন্মের সময় নাভিমূল রেখে দেওয়া হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে নাভিতে মিথাইল মারকারির সঞ্চিত মাত্রা অনেক বেশী। মায়ের দেহের মিথাইল মারকারি গর্ভফুলের মাধ্যমে ভ্রূণকে বিষাক্ত করে। মিনামাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় দেখা গেছে যে মায়ের দুধে মিথাইল মারকারির সঞ্চিত মাত্রা সহনীয় মাত্রার থেকে অনেক বেশী। 1955 সাল থেকে 1962 সালের মধ্যে যে কজন শিশু জন্মগ্রহণ করেছে বর্তমানে তাদের শতকরা 40 জনই সরকারীভাবে স্বীকৃত মিনামাতা রোগী[9]।

1965 সালে আবার দেখা গেল এই রোগের প্রাদুর্ভাব। এবারে আর মিনামতায় নয়, দেখা গেল আগানো নদীর পারে নিগাতায়। 30 জন আক্রান্ত হ'ল, 50 জন প্রাণ হারাল[10]। সরকারী সূত্রে এই দুর্ঘটনাকে আগের বছরের ভূমিকম্পের সাথে সম্পর্কিত করার চেষ্টা হল। বহু তথ্য সংগ্রহ করে রিসার্চ গ্রুপ আবার প্রমাণ করল যে এই দুর্ঘটনার সাথে ভূমিকম্প যুক্ত নয়। এই প্রাদুর্ভাবও আসলে মিনামাতা রোগের— এই রোগের উৎস নিগাতার সাওডেঙ্কো কোম্পানী। যে কোম্পানীর রাসায়নিকের বর্জিতাংশ নদীর জলে পড়ে মিনামাটার মতই মারকারি দূষণ বাড়িয়ে চলেছে। চরম সরকারি ঔদাসিন্যের ফলে সাওডেঙ্কো কোম্পানীর মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে নিগাতা-মিনামাতার আক্রান্ত ব্যক্তিরা আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো।

মিনামাতা রোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে দুশ্চিন্তার কথা হল যে এই রোগের কোনো চিকিৎসা নেই বললেই চলে। কারণ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোষ-সমূহ একবার নষ্ট হলে পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। অবশ্য কয়েকটি রাসায়নিক উপশমক ব্যবহার করে সীমিত ফল পাওয়া গেছে। এই রোগের ক্ষেত্রে যেহেতু সামাজিক সমস্যা জড়িয়ে আছে সেই জন্য পুনর্বাসনমূলক প্রকল্প কার্যকরী হতে পারে। প্রাথমিক চিকিৎসার মধ্যে ম্যাসেজ, হট স্প্রিং বাথ এবং আকুপাংচার চেষ্টা করা যেতে পারে। স্বল্প আক্রান্ত ব্যক্তি ও শিশুদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসায় সেরে ওঠার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যেহেতু প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়ে না সেহেতু সেরে ওঠার সম্ভাবনা কম[11]।

মিনামাতার সংগ্রাম : 1956 সাল থেকেই বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে মিনামাতার সংগ্রামের ইতিহাস শুরু। সরকারী ঔদাসিন্য ও পরোক্ষে চীজো কোম্পানীকে মদত দেওয়ার নীতি মিনামাতার মানুষকে স্বাবলম্বী করে তুলল। চিজো কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের কাজে বাধা দিতে শুরু করল। চিজো কোম্পানীর হাসপাতালের অধিকর্তা ডঃ হাজিমে হোসোকায়োর প্রতি-বেদনে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। যখন দেখা গেল যে চিজো কোম্পানী পারদ দূষণের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী তখন তারা হোসোকায়োকে তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রকাশে বাধা দিল। আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংগ্রামী চেতনা আরো বৃদ্ধি পেল। তারা সরকারকে চাপ দিল এই দূষণের

জন্য চীজো কোম্পানীকে সরাসরি অভিযুক্ত করতে। দ্বিতীয়বারের মিনামাতা রোগের প্রাদুর্ভাবের পর আক্রান্ত ব্যক্তি ও সহায়ক গোষ্ঠীগুলি আরো জোরদার চাপ সৃষ্টি করল। কিন্তু সরকার ও সাওডেংকো কোম্পানী এই দায়িত্ব অস্বীকার করল। চীজোর মত সাওডেংকো কোম্পানীরও সরকারী মহলে ছিল বিস্তর প্রভাব। জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সাতোর আত্মীয়দের এই কারখানা বাধানিষেধের আওতায় এল না। আক্রান্ত ব্যক্তিরা আইনের শরণাপন্ন হল। তবে শুধু কোর্টের চৌহদ্দীর মধ্যেই তাদের আন্দোলন সীমাবদ্ধ রইল না। তাদের প্রচার আন্দোলনে সাধারণ মানুষের মধ্যেও আলোড়ন সৃষ্টি হল। সরকারী তরফে ক্ষতিপূরণ কমিটি (Compensation Expert Commitee) মৃতদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ঘোষণা করল সর্বোচ্চ 40 লক্ষ ইয়েন (1 লক্ষ টাকা) আর আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ঘোষণা করল 3 লক্ষ 80 হাজার ইয়েন (8 হাজার টাকা) বাৎসরিক ভাতা। নাগরিক কমিটি ও সহায়ক গোষ্ঠীগুলি এর বিরোধিতা ক'রল। তখনও সরকারী মতে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা মাত্র 120 জন ও মৃতের সংখ্যা 67 জন। আক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বীকৃতি নিয়ে শুরু হল সরকারী টালবাহানা। আসলে এই সময়ে কমবেশী মাত্রায় মিনামাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এক লক্ষাধিক লোক আক্রান্ত[12]।

1970 সালে জাপানে দূষণ বিরোধী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। প্রায় সর্বত্র আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ক্যাডমিয়াম দূষণের বিরুদ্ধে, কাগজ শিল্পের দূষণের বিরুদ্ধে, পেট্রো-কেমিকাল্‌স্ কমপ্লেক্সের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। এর আগে 1964 সালে মিসিমানাজিনু এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা পেট্রো কেমিকালস্ কমপ্লেক্স স্থাপন স্থগিত রাখতে সরকারকে বাধ্য করে[13]। এই এলাকার অধিবাসীরা দূষণবিরোধী আন্দোলনে এক নূতন মাত্রা যোগ করে। সরকারী তরফেও দূষণ সম্পর্কে আগের তুলনায় অনেক বেশী ভাবনাচিন্তা হতে থাকে। অবশেষে সরকার কেন্দ্রীয় দূষণ পর্ষৎ (Central Pollution Board) গঠন করে। এই বছরই আক্রান্ত ব্যক্তিদের ত্রাণ আইন (Victims Relief Act) প্রণীত হয়। এবং সরকারীভাবে স্বীকৃত রোগীদের বিনা খরচে চিকিৎসা করা যাবে বলে ঘোষণা করা হয়। আইনী ও চিকিৎসা ব্যবস্থার চাপে পড়ে মিনামাতার রোগীরা, যাদের মধ্যে বেশীর ভাগই সাধারণ জেলে, এক গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরতে থাকে। 1973 সাল পর্যন্ত মাত্র 358 জনকে রোগী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

1971 সালের নভেম্বর মাসে রোগীদের সংগঠন Independent Negotiation Group পরিবারপিছু 3 কোটী ইয়েন (8 লক্ষ টাকা) ক্ষতিপূরণ দাবী আদায়ের জন্য চিজো কারখানার গেটে ধর্না দিতে শুরু করে। চিজো কোম্পানীর পরিচালন সমিতি শ্রমিকদের উপর প্রভাব খাটিয়ে আন্দোলনকারীদেরকে কোনঠাসা করে দিল। এর পরে এই গোষ্ঠী পরিচালকদের সাথে আলাপ আলোচনা চালাতে টোকিও অফিসে যায়। চিজো কোম্পানী আলাপ আলোচনা ত' করেই না বরং শ্রমিকদের দিয়ে আন্দোলনকারীদের হটিয়ে দেয়। আন্দোলনকারীরা অফিসের সামনে অবস্থান শুরু করে। চিজো কোম্পানী কেবলমাত্র শ্রমিকদেরই এই আন্দোলন দমনে ব্যবহার করেনি, আন্দোলনকারীদের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি করেছে। এরা নূতন করে স্বীকৃত রোগীদের ক্ষতিপূরণের দাবী সরকারী বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার এবং Negotiation Group এর সাথে কোনরকম আলোচনা না করার সিদ্ধান্ত নেয়। অবশেষে 1973 সালের 20শে মার্চ আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়ঃ পারদ দূষণ জনিত মিনামাতা রোগের জন্য চিজো কোম্পানী সরাসরি দায়ী এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে কোম্পানীকে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দিতে হবে 16 থেকে 18 মিলিয়ন ইয়েন (4 লক্ষ টাকা)। এই পর্যায়ে আন্দোলনকারীরা একত্রে টোকিও অফিস ঘেরাও-এ অংশ নেয়। অবশেষে চিজো কোম্পানীর মালিকেরা আন্দোলনকারীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে এবং আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণের মধ্যে বার্ষিক ভাতা ও চিকিৎসার ব্যয়ভার অন্তর্ভুক্ত করে। এখন পর্যন্ত 800 ব্যক্তিকে মিনামাতা রোগে আক্রান্ত বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যদিও আরো 2000 ব্যক্তি এই স্বীকৃতির জন্যে ইতিমধ্যেই আবেদন করেছে।

1970 সালে জাপানে শিল্পের, বিশেষ করে উচ্চ কারিগরী শিল্পের এক জোয়ার দেখা যায়। সম্ভবতঃ জাপানের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংকট এড়ানোর প্রচেষ্টায় এই নূতন শিল্পোদ্যম গড়ে ওঠে। 1968-69 সালের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ছাত্র আন্দোলনে তার প্রভাব দূষণবিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করে তুলতে সাহায্য করলেও এই আন্দোলন মূলতঃ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেই গড়ে ওঠে। সরকারী সহযোগিতা ত' দূরের কথা, রাজনৈতিক দলগুলিও দূষণবিরোধী আন্দোলনে ততটা আগ্রহী ছিল না। রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীগুলি এই আন্দোলনে মদত জুগিয়েছে হয় নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য নয়ত নিজেদের দলীয় বা গোষ্ঠীগত প্রভাব বিস্তারের জন্য। এই কারণে রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীগুলি এই আন্দোলনে ছাপ ফেলতে সমর্থ হয় নি। বরং দূষণ-বিরোধী আন্দোলনই রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীগুলির কর্মীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে আংশিকভাবে সমর্থ হয়েছে। এই আন্দোলনে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের সাথে দূষণ সমস্যাকে এক সাধারণ ছকে ফেলে দেওয়া হয় নি। একদিকে যখন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীগুলি দূষণবিরোধী আন্দোলনের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট, অপরদিকে তখন আন্দোলনকারীরা দূষণ সমস্যাকে সামাজিক স্তরে আলোচনার বিষয় হিসেবে নিয়ে যেতে উদ্যত। দৃষ্টান্তঃ দূষণ সমস্যাকে স্কুল স্তরে পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা। এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হ'ল আক্রান্ত ব্যক্তিরাই এই আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্বে আছে, তাদের সহযোগিতা করছে সহায়ক গোষ্ঠীগুলি। আন্দোলনকারী গোষ্ঠীগুলি ব্যাপক তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে ধীরে ধীরে প্রচার আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এক লাফে সংঘর্ষের পথে পা

বাড়ায়নি। আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে এটা আমাদের কাছে শিক্ষণীয় দিক [15]।

আন্দোলনের সমস্যা ঃ এই আন্দোলনের নানা সমস্যার দিকও আছে। চিজো কোম্পানী মিনামাতার অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রায় দশ হাজার শ্রমিক এই কারখানায় কাজ করে। মিনামাতা অঞ্চলের জেলে পরিবারগুলি ছাড়া প্রায় সমস্ত পরিবারই চিজো কোম্পানীর ওপর নির্ভর করে। চিজো কোম্পানী এই সুযোগ নিয়ে শ্রমিকদের ও আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়েছে। এমনকি আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংগঠনগুলির মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি করতে পেরেছে। কারখানা শ্রমিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইউনিয়ন এই আন্দোলনে সামিল হওয়া ত' দূরের কথা এই আন্দোলনকে শ্রমিক স্বার্থ পরিপন্থী বলেই মনে করে। তাদের ধারণা, চিজো কোম্পানীকে যত বেশী ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ততই শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধে কমে যাবে। আন্দোলনকারীদের কাছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা [16]।

আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে রোগী হিসেবে সরকারী স্বীকৃতি দান আর একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা। একে ত' স্বীকৃতি দানে সরকারী টাল-বাহানা, আইনী ও চিকিৎসা ব্যবস্থার ফাঁদ, তার উপর আবার অন্যান্য সামাজিক সমস্যার জন্য এক অতি নগণ্য সংখ্যক রোগীরই সরকারী স্বীকৃতি মিলেছে। চাকরী পাওয়া ও বিয়ে হওয়া, সরকারী ভাবে স্বীকৃত রোগীদের কাছে এক সমস্যাবিশেষ।

চিকিৎসা ও পুনর্বাসন আন্দোলনকারীদের কাছে একটি গভীর সমস্যা। চিকিৎসা প্রায় নেই বললেই চলে। এদিকে যত দিন যায় তত বেশী বেশী করে রোগের নানা উপসর্গ ধরা পড়ে। আবার রোগের প্রকৃতির ফলে রোগীর মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলে।

এ ছাড়া রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীগুলির সমর্থন তেমন পাওয়া যায় নি, নিজেদের ভিতর বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে, এসবও বড় সমস্যা।

পাশাপাশি ভূপাল ঃ মিনামাতার সঙ্গে ভূপালের অভিজ্ঞতার অনেক মিল। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই ভূপালে বাধানিষেধ ছিল অনেক বেশি। মিথাইল মার্কারী দূষণের তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ায় চিজো কোম্পানী যেমন তথ্য সরবরাহে বাধানিষেধ আরোপ করতে শুরু করে, ভূপালে তার চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে প্রথম দিন থেকেই মিথ্যা প্রচার শুরু হয়ে যায়। মৃতের সংখ্যা, বিষাক্ত গ্যাসের প্রকৃতি ('মিক' না ফসজেন), সরকারী ত্রাণ ও চিকিৎসাব্যবস্থা (সোডিয়াম থায়োসালফেট চিকিৎসা) নিয়ে যে মিথ্যা প্রচার শুরু হয় তার নজির মেলা ভার। বেসরকারী সংস্থাগুলির (একলব্য, দিল্লী সায়েন্স ফোরাম, জাহরিলী গ্যাস কাণ্ড সংঘর্ষ মোর্চা) কাজকর্মের ওপর বাধানিষেধ আরোপ, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক মেডিকেল ডকুমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করার মত ঘটনা ভূপালে ঘটে চলেছে। ইউনিয়ন কার্বাইডের অপরাধের তথ্য গোপন করার চক্রান্ত প্রথম থেকেই চলে আসছে। তাতে প্রত্যক্ষভাবে মদত যোগাচ্ছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার। ভূপালের জনসমষ্টির দরিদ্রতম অংশই এই বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত, যাদের সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতা দুর্বলতম। এদের সবাক হওয়ার মত, নিজেদের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আন্দোলন পরিচালনা করার মত পরিস্থিতি এখনও গড়ে ওঠে নি। সহায়ক গোষ্ঠীগুলির ভূপালে আক্রান্ত ব্যক্তি বা পরিবারবর্গের আস্থা অর্জন করার কাজ অসম্পূর্ণ। কারণ, যেটুকু ত্রাণ পাওয়া যাবে, যেটুকু ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে তা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থেকেই পাওয়া যেতে পারে একথা তারা অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে। যদিও রাজনৈতিক দলগুলির কাছে ভূপালের দুর্ঘটনা নির্বাচনী প্রচার ছাড়া আর কোন গুরুত্ব পায়নি।

মিনামাতার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে ভূপালে বা অন্যত্র দূষণ-বিরোধী আন্দোলন কি গতানুগতিক পথ থেকে সরে নতুন পথে চলবে? না কি যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহের কাজ না করেই, যথেষ্ট অনুসন্ধানের পথে না গিয়েই আমরা প্রচলিত আন্দোলনের পথে পা বাড়াব? আক্রান্ত ব্যক্তি দ্বারাই আন্দোলন পরিচালনার কথা না ভেবে নিজেদের রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে আন্দোলন পরিচালনার স্বার্থে কাজ করব? আক্রান্ত ব্যক্তিদের সমস্যাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে কি আমরা একে সমাজ-রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টারই একটা মামুলী ধাপ হিসেবে গণ্য করব? সুদূর ভবিষ্যতে হলেও হায়ামাতোর আবেদন সার্থক করে তোলার কাজ কি আমরা শুরু করতে চাই?

সূত্রসমূহ ঃ

1. মিনামাতা ডিজিস—ডাঃ মাসাজুমি হারাদা, "সলিডারিটি নেটওয়ার্ক এশিয়া এন্ড মিনামাটা", পৃঃ 6; 2. মিনামাতা ডিজিস—ডাঃ মাসাজুমি হারাদা "প্লেনাম পাবলিশিং কর্পোরেশন" 1982, পৃঃ 139-140 3. মিনামাটা ডিজিস—ডাঃ মাসাজুমি হারাদা "সলিডারিটি নেটওয়ার্কএশিয়া এন্ড মিনামাটা" পৃঃ 10 4. ঐ পৃঃ 10 5. ঐ 6. মিনামাটা ডিজিস – ডাঃ মাসাজুমি হারাদা, "প্লেনাম পাবলিশিং কর্পোরেশন" 1982 পৃঃ 140 7. ঐ পৃঃ 140-141 8. ঐ পৃঃ 146 9. ঐ পৃঃ 141-142 10. মিনামাটা ডিজিস "ডাঃ মাসাজুমি হারাদা", সলিডারিটি নেটওয়ার্ক, এশিয়া এন্ড মিনামাটা, পৃঃ 6 11. মিনামাটা ডিজিস —ডাঃ মাসাজুমি হারাদা, পৃঃ 18। 12. ঐ পৃঃ 16-27 13. কোগাই দি নিউজলেটার ফ্রম পলিউটেড জাপান। বিশেষ সংখ্যা—পারদ দূষণ, 1975। দি রোল অফ সিটিজেনস মুভমেণ্ট. জুন উই, পৃঃ 13-20 14. মিনামাটা ডিজিস—ডাঃ মাসাজুমি হারাদা, "নেটওয়ার্ক এশিয়া এন্ড মিনামাটা" পৃঃ 24-29 15. আফটারম্যাথ ইন মিনামাটা—ডোনাল্ড থার্সটন, কোগাই, বিশেষ পারদ দূষণ সংখ্যা 1975, পৃঃ 31-42 16. ঐ পৃঃ 39-40। এ ছাড়াও এই নিবন্ধটি রচনা করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে সলিডারিটি নেটওয়ার্কের সম্পাদক ইয়োয়িচি তানির সঙ্গে শুভাশিস মৈত্র, নাজেস আফরোজ ও নীলাঞ্জন দত্তের সাক্ষাৎকার।

□

বিজ্ঞানের ইতিহাস ঃ অন্য আরেকটি ছবি

লতিকা গুহ

বিজ্ঞানের গবেষকরা একটি বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে এবং পরস্পরের সঙ্গে এঁরা নির্দিষ্ট কিছু সম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ। বিজ্ঞানের গতিধারাকে বুঝতে হলে এই সম্পর্কগুলিকে গবেষকদের নিজস্ব মানসিক প্রত্যাশাগুলিকে, বুঝতে হবে। বিজ্ঞানের 'সমাজতত্ত্বের' এই দৃষ্টিকোণ থেকে একটি আলোচনা—

বিজ্ঞান-বিকাশের পেছনে একটা সামাজিক প্রক্রিয়া নিয়ত কাজ করে। এই প্রক্রিয়ার আলোচনা ও বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের সমাজতত্ত্ব। সাম্প্রতিক কালে এই বিজ্ঞানের সমাজতত্ত্ব, ক্রমশঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে।

এই প্রসঙ্গে টি. এস. কুন লিখিত "দ্য স্ট্রাকচার অব সায়েণ্টিফিক্ রেভলিউশনস" গ্রন্থের মূল বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' (মার্চ-এপ্রিল 1985) পত্রিকায় পড়েছি। কুন-এর বক্তব্য আজ অধিকতর পরিচিতি লাভ করেছে, কিন্তু এতদিনে এই বক্তব্যের নানা রকম সমালোচনা সংশোধন, ও সংযোজনও হয়েছে। এখানে কুন-পরবর্ত্তী একটি বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে আমার মনে হয়েছে—কুন-পরবর্ত্তী এই সংশোধিত তাত্ত্বিক আলোচনাই অধিকতর কার্যকরী।

বিজ্ঞানের সমাজতত্ত্বের গবেষণাক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যাগুলি এখনো সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হয় নি। এর সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানগুলি ঠিক প্রচলিত বিশ্লেষণী কাঠামোয় চালান যায় না। তাই এম. জে. মুলকে (M. J. Mulkay ঃ "Conformity And Innovation In Science", The Sociological Review Monograph No. 18, The Sociology of Science, কীল বিশ্ববিদ্যালয়, 1972) আধুনিক বিজ্ঞানে নবোদ্ভাবনের (Innovation) সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য একটি আলাদা কাঠামো তৈরী করেছেন। এই কাঠামোটি প্রধানত তিনটি প্রশ্নের সমাধান দাবী করে—যেমন, বৈজ্ঞানিক মহলে বিভিন্ন তথ্যাদির (1) গঠন, (2) প্রকাশ ও (3) গ্রহণের পেছনে কোন্ কোন্ সামাজিক প্রক্রিয়া কাজ করে ?

এই প্রসঙ্গেই মুলকে আবার বুনিয়াদি গবেষক গোষ্ঠীকে সামগ্রিক ভাবে অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে পৃথক করেছেন ও তাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। যেমন ঃ এদের একটি সাধারণ পেশাগত লক্ষ্য থাকে এবং মনে করা হয় যে এই লক্ষ্যটি হচ্ছে এতাবৎ আরব্ধ জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো। দ্বিতীয়ত, তারা যেন একটা পরিবারসুলভ ঐক্য গড়ে তোলে যার ভিত্তি হচ্ছে কিছু নির্দিষ্ট টেকনিক্যাল দক্ষতা, যা কিনা আবার তাদেরকে একটি বিশিষ্ট পরিচয়চিহ্ন দান করে। তৃতীয়ত, এরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে অবশ্যই জড়িত থাকে। চতুর্থত, এরা একই রকম প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশ মাধ্যম বা প্রচার ব্যবস্থাকে আঁকড়ে থাকে, যেমন পেশাগত সাময়িকী ও সম্মেলনাদি। পঞ্চমত, এই গোষ্ঠীর বাইরের মানুষেরাও এদেরকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে। অবশ্য এদের কেউ কেউ কখনো কখনো বিস্তৃততর ক্ষেত্রেও তাদের পেশাগত উদ্যোগকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। শেষত, এই গবেগকরা কিন্তু নিজেদের মধ্যে আবার এক সামাজিক সম্পর্কের জটিল জালে জড়িয়ে থাকে। এই গোষ্ঠীর মধ্যেই আছে আরও অভ্যন্তরীণ পৃথকীকরণ, আছে নির্দ্দিষ্ট বিশেষীকৃত ক্ষেত্র। যথা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রগুলিরও আবার আরও বিভক্তিকরণ হয় সামাজিক তাৎপর্য ও মননশীলতার বিচারে। তাই, পদার্থবিজ্ঞান বিভক্ত হচ্ছে সলিড স্টেট, হাই এনার্জি, প্লাসমা ইত্যাদি বিশেষীকৃত বিভাগে। এবং এই রকম অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতেও। কিন্তু এখানেই ব্যাপারটা থেমে থাকছে না। এই প্রতিটি বিশেষীকৃত বিভাগ আবার সুনির্দ্দিষ্টভাবে কিছু সামাজিক কর্মকান্ডের জন্ম দেয়। এই কর্মকান্ডের অংশগ্রহণকারীরা সাধারণভাবে পরস্পরের মধ্য দিয়ে এবং সাময়িকীগুলোর মাধ্যমেও নিজেদের মধ্যে লেনদেন ঘটায় এবং পরস্পরের গবেষণাকে প্রভাবিত করে। এই পরস্পরজড়িত কর্মকান্ডের মধ্য দিয়েই বৈজ্ঞানিক নবোদ্ভাবনা সংঘটিত হয়।

মুলকে মনে করেন, গবেষকরা তাদের স্বীকৃত সমস্যাগুলি ও তার সমাধানগুলিকেও খুব সংকীর্ণভাবেই উপলব্ধি করে থাকে। এরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত শুধুমাত্র এই কারণেই নয় যে, তাদের মধ্যে সততই একটা উচ্চক্রমের আন্তঃক্রিয়া চলতে থাকে। তাছাড়াও তাদের মধ্যে নিবিড় ঐক্যসূত্র গড়ে ওঠে এই কারণেও যে তারা একইরকম জ্ঞানগত ও টেকনিক্যাল রীতিকে স্বীকৃতি দেয় ও প্রয়োগ করে। তাই তাদের স্বীকৃত জ্ঞানগত ও টেকনিক্যাল রীতির নিরিখে কোন কিছু ব্যতিক্রম ঘটলেই সেটাকে তলিয়ে বিচার না করেই ঝটতি অবৈজ্ঞানিক বলে পরিহার করে। এ প্রসঙ্গে, বদ্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন মননতায় আক্রান্ত বিজ্ঞানী হিসাবে মুলকে পোলানিয়াই—এর নাম উল্লেখ করেছেন, যিনি এ্যাড্সরপশান পোটেন্সিয়াল (Adsorption Potential) তত্ত্বের আলোচনা করেছেন এই রকমেরই এক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে (M. Polanyi ঃ "The Potential Theory of Adsorption ঃ Knowing and Being")।

জ্ঞানগত ও প্রায়োগিক রীতির মধ্যে সাযুজ্য রক্ষিত হয় সামাজিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে। প্রতিটি গবেষকের কাছে আশা করা হয় যে, সে বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীকে মূল্যবান তথ্য দ্বারা সমৃদ্ধ করবে। কিন্তু তথ্যটি মূল্যবান কিনা তা বিচার করবে সংশ্লিষ্ট কোন যোগ্য গবেষণাকারী এবং অবশ্যই স্বীকৃত জ্ঞানগত ও প্রায়োগিক মানের ভিত্তিতেই এই মূল্য নির্দ্ধারণ করা হয়। এরই সঙ্গে উপযুক্ত কোন সাময়িকীতে যখন এই গবেষণার

সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হবে একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত হিসাবে, তখনই কেবল এই গবেষক পেশাগত স্বীকৃতি পাবে। এই পেশাগত বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি বিভিন্ন আকারে দেখা যায়, যেমন—প্রকাশিত এই সিদ্ধান্তটিকে চলতি গবেষণার ক্ষেত্রে একটি অবদান বিশেষ বলে সাময়িকীতে দাবী করা হয়। অথবা অন্যান্য লেখকের দ্বারা ঐ তথ্যের উল্লেখ বা উদ্ধৃতি, বা ঐ তথ্য সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ লাভ, পুরস্কার লাভ, ইত্যাদি। গবেষকের পদোন্নতি, প্রাচুর্যময় জীবনযাত্রা, গবেষণার জন্য পৃথক তহবিল ও কর্তৃত্বমূলক পদাধিকার ইত্যাদি গবেষকের পুরস্কার ও স্বীকৃতি হিসাবে দেখা দেয়। গবেষণালব্ধ তথ্যের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী স্বীকৃতির স্তর নির্দ্ধারিত হয়। এই পেশাগত স্বীকৃতি গবেষক বিজ্ঞানীদের কাছে ভয়ংকর মূল্যবান, যদিও এই বিজ্ঞানীরা মনে করেন না যে শুধু মাত্র স্বীকৃতি লাভের জন্যই তাঁরা তথ্যের লেনদেন করছেন। তারা দাবী করেন, বিজ্ঞান নিরাবেগ হয়ে বস্তুজগতের সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করে। সামাজিক স্বীকৃতিটা কেবল এর একটি অনুষঙ্গ মাত্র।

এম. জে. মুলকে মনে করেন, বিজ্ঞানীদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রধান ত্রুটি এই যে বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলি যে সামাজিকভাবে সংজ্ঞায়িত, একথা তাঁরা উপেক্ষা করেন। তাই সমস্যা নির্বাচনের সময়েই তাঁরা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃতি অর্জনের চিন্তাটাকেও ঠাঁই দিয়ে থাকেন। তাছাড়া এঁরা মানবিক অভিপ্রায়ের জটিলতাকেও গুরুত্ব দেন না। নিছক মননশীলতা বা নিছক স্বীকৃতি অর্জন কিন্তু গবেষকদের একমাত্র প্রেরণা নয়। দুটোই এক সঙ্গে ক্রিয়াশীল ও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রেরণা যাইই হোক না কেন, গবেষকদের এটা মাথায় রাখতেই হয়, যে তাদের কাজের স্বীকৃতির জন্য প্রচলিত জ্ঞানগত ও প্রায়োগিক প্রত্যাশার মধ্যে সাযুজ্য বজায় রাখতেই হবে।

যেহেতু গবেষণার আকর্ষনীয় বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকে, তাই গবেষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। তাই কোন সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে, কে অগ্রাধিকার পাবেন এই বিতর্কের সূত্রপাত হয় অথবা কত দ্রুত গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত সাময়িকীগুলোতে ছাপানো যায় তার চেষ্টা চলে। তাছাড়া, নূতন এক ধরনের সময়িকী বেরুচ্ছে, যাতে গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তগুলির চাইতে বরঞ্চ ভাবী কোন গবেষণার পরিকল্পনা বা বাসনাকে নথিভুক্ত করা হয়। এইভাবে যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়, তার লক্ষ্য হচ্ছে কিন্তু স্বীকৃতিলাভ। অবশ্য এই ধরণের প্রবণতা শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই দেখা যায় তা নয়। তবু এটা এখানে বেড়ে গেছে তিনটি কারণেঃ (1) বহু বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে জ্ঞানগত কাঠামোটি অপেক্ষাকৃত সুনিশ্চিত, তাই কোন্ সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন্ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হবে এ সম্পর্কে সন্দেহ প্রায় থাকেই না। (2) বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিযোগী ও সমঝদার একই স্তরের। যখন নূতন কোন উদ্ভাবন কোন অবদান আনে, তখন এই বৈজ্ঞানিক অবদানের সমঝদারদের পক্ষে এক নয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, কিন্তু এরা এবং গবেষকরা সবাই-ই জানে যে এই অবদান আরও নবতর প্রতিযোগিতার তাগিদ সৃষ্টি করবে। (3) এই প্রতিযোগিতা গবেষণাকর্মীদের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায় এবং এই সংখ্যাবৃদ্ধি প্রতিযোগিতাকে পক্ষান্তরে প্রভাবিত করে, কারণ সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে স্বীকৃতি খুব দুর্লভ হয়ে পড়ে। ফলত, প্রতিযোগিতা তীব্রতর হয়ে চলতেই থাকে। থামে না। এরই সঙ্গে জ্ঞানগত ও টেকনিক্যাল প্রত্যাশার মধ্যে গবেষকদের সঙ্গতি বজায় রেখে চলতেই হয়। এই ভাবেই তাদের নিজেদের মধ্যেই তৈরী হয় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। মুলকের মতে, এহেন অবস্থায় সাময়িকীগুলি কোন গবেষণা গ্রহণ করবে, বা না করবে, সে বিবেচনা এই নিয়ন্ত্রনী ব্যবস্থার একটা সংযোজনমাত্র। যা কিছু নূতন উদ্ভাবন, অবশ্যই ঐ সঙ্গতি বা সাযুজ্য রক্ষার মধ্য দিয়েই ঘটে যায়।

এম. জে. মুলকে এখানে কুন (Kuhn) বর্ণিত "নর্মাল সায়েন্স"-এর কথা উল্লেখ করে বলছেন, যে ঐ "নর্মাল সায়েন্স বা স্বাভাবিক বিজ্ঞানই" হচ্ছে ঐ ধরনের নবোদ্ভাবন। তিনি মনে করেন স্বাভাবিক বিজ্ঞান গড়ে ওঠে তখনই, যখন গবেষকদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নূতনতর ও মৌলিক কোন আবিষ্কার ঘটানোর চাইতে বরঞ্চ চলতি জ্ঞানগত ও টেকনিক্যাল কাজের ক্ষেত্র ও যথার্থ্যকে আরও বিস্তৃত করা। এরকম গবেষণা, হয় পুরোটাই বাতিল হয়, নয়তো সংশ্লিষ্ট মুষ্টিমেয় গবেষকদের দ্বারা উল্লিখিত হয়। এই স্বাভাবিক বিজ্ঞানের কাজই হচ্ছে সাম্প্রতিককালে স্বীকৃত সমস্যাগুলির সমাধান করা। এতে জ্ঞানগত ও টেকনিক্যাল অনুমানের ধারাকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয় বলেই এখানে গবেষকরা অপেক্ষাকৃত ছোটখাটো সমস্যার খুঁটিনাটি অনুসন্ধানগুলি চালিয়ে যায়, যা কিনা মননশীল গবেষণায় আদৌ সমাধানের চেষ্টা না করে ছেড়ে দেওয়া হয়। অবশেষে এই সমস্যাগুলির সমাধান হয় পূর্ব ধারণাগুলির বিশেষ কোন পরিবর্তন না ঘটিয়েই। অথচ, স্বাভাবিক বিজ্ঞান ক্রমাগতই বিসদৃশ সিদ্ধান্তগুলিকে খুলে ধরতে থাকে যা কিনা আর চলতি ব্যাখ্যার সঙ্গে মোটেও খাপ খায় না। যতই এই বিসদৃশতার চাপ বাড়তে থাকে ততই চলতি অনুমান-সমষ্টি (Paradigms) সম্পর্কে আস্থা কমতে থাকে। বিশেষ করে নবীন গবেষকরা এই বিসদৃশতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। ফলে সৃষ্টি হয় এক সংকটের। তখন আর স্বাভাবিক বিজ্ঞানের কোন বিস্তার ঘটেনা, যেহেতু এখন সাধারণ স্বীকৃত মননশীল নিরিখের আর কোন অস্তিত্ব থাকছে না। তৈরী হয় তখন নূতন অনুমান-সমষ্টি (Paradigms) এবং স্বাভাবিক বিজ্ঞানে শুরু হয় নূতন এক যুগ।—একেই কুন বলছেন বিজ্ঞান-বিপ্লব।

এ প্রসঙ্গে এম. জে. মুলকে মন্তব্য করছেন যে কুন এখানে এক ধরনের নবোদ্ভাবনের সঠিক বর্ণনা দিচ্ছেন, কিন্তু তিনি এর পেছনের সামাজিক প্রক্রিয়াগুলিকে চিহ্নিত করেননি। এবং অবশ্যই এগুলি হচ্ছে প্রতিযোগিতা, লেনদেন ও স্বীকৃতি বিতরণ। স্বাভাবিক বিজ্ঞানে নিয়ন্ত্রিত

গবেষণাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ফলে সমস্যাগুলির খুঁটিনাটি অনুসন্ধানের একটা প্রবণতা জন্মায়। এই ধরণের গবেষণা, এক সুনির্দিষ্ট মননশীল মানের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, চলতি আকর্ষণীয় ও লাভজনক সমস্যাগুলিকে বাতিল করতে থাকে এবং আরও নূতন ও আরও লাভজনক ও আকর্ষনীয় বিষয়বস্তু নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করে, কারণ স্বীকৃতি অর্জনের হিসেবটা তাদের মাথায় সবসময়েই কাজ করতে থাকে। এতেই কিন্তু বিসদৃশ সমস্যাগুলি অনবরত জন্ম নেয় স্বাভাবিক বিজ্ঞানের গবেষণায় এবং তাৎপর্যপূর্ণ ও ন্যায্য সমস্যাগুলির অনুসন্ধানের অনুপাত কমতে থাকে। বিসদৃশ বিষয়গুলির অনুসন্ধানের উপযোগিতা অধিকতর গুরুত্বলাভ করতে থাকে। এই ভাবেই বৈপ্লবিক বিজ্ঞানের অস্থায়ী কার্য্যকলাপ শুরু হয়। পূর্বতন মননশীল মানের অবমূল্যায়ন ঘটে। গবেষকরা সংকটে পড়ে যান এবং বুঝে উঠতে সময় লাগে, কোন গবেষণা স্বীকৃত হবে বা না হবে। এর ফলে চলতি সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিজ্ঞানীদের ওপর আর তখন কাজ করে না। কিন্তু অবশেষে নূতনতর পরিপ্রেক্ষিতে লাভজনক গবেষণার সম্ভাবনার পথ খুলে যায়। স্বাভাবিক বিজ্ঞান আবার কাজ করতে শুরু করে। সাময়িকীগুলো জ্ঞানগত ও টেকনিক্যাল রীতিগুলোকে নূতন করে আবার সূত্রবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়।

আধুনিক প্রতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মননশীল পরিপ্রেক্ষিতের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে নূতনতর ভাবনাগুলির সোৎসাহ পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে এবং চলতি ভাবনাগুলির বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলে। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে কোয়ান্টাম তত্ত্বমুখীন উত্তরণ। এ প্রসঙ্গে অবশ্য এম. জে. মুলকে মনে করেন যে স্বাভাবিক থেকে বৈপ্লবিক, তারপর আবার স্বাভাবিক বিজ্ঞান—এই চক্ররীতি স্বতঃসিদ্ধ ধারা নয়। তিনি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির রূপ নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে ইনভ্যারিয়ান্ট (Invariant) বা স্থির-মানের তত্ত্বের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। এই তত্ত্বের পরিবর্তন ঘটেছিল মৃদু প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে বিকল্প ক্ষেত্রগুলির অবিরাম স্থান পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে। অবশ্য অনেকে বলবেন যে গণিত অন্যান্য বিজ্ঞান থেকে পৃথক এবং মননশীল গতিময়তা গণিতে যতখানি প্রয়োজনীয়, অন্যান্য বিজ্ঞানে তা নয়। কিন্তু এখানে মুলকে "ফাজ" (Phage) গোষ্ঠীর উদ্ভবের কথা উল্লেখ করে বলছেন যে মননশীল গতিময়তার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন ঘটতে পারে, ঘটে থাকে।

এই প্রসঙ্গেই মুলকে মনে করছেন যে "বৈজ্ঞানিক গতিময়তা" উদ্ভাবনে খুব দ্রুত সহায়তা করে। তিনি বলছেন যে একটি মননশীল ও সামাজিক কর্মকান্ড থেকে অন্যটিতে গবেষকদের প্রবেশের কথা বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের ইতিহাসে উপেক্ষিত হলেও এ ধরণের গতায়াত যে জ্ঞানের বিকাশের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে তা অস্বীকার করা কঠিন। হল্টন (Holton : Models for Understanding the growth and Excellence of Scientific Research) এই গতিময়তার তাৎপর্য্য ও স্বাভাবিকত্বের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। এ প্রসঙ্গে মুলকে দুটি বিশেষ ক্ষেত্রে দুটি নবোদ্ভাবকের উল্লেখ করেছেন। একটি রসায়ন বিভাগে Xenon সম্পর্কিত, অন্যটি Pulsars সম্পর্কিত। এই ধরনের আবিষ্কার বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটায় নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলির চলতি অজ্ঞানতা দূর করে, আবার এগুলি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের গবেষকদের কাছে চ্যালেঞ্জ

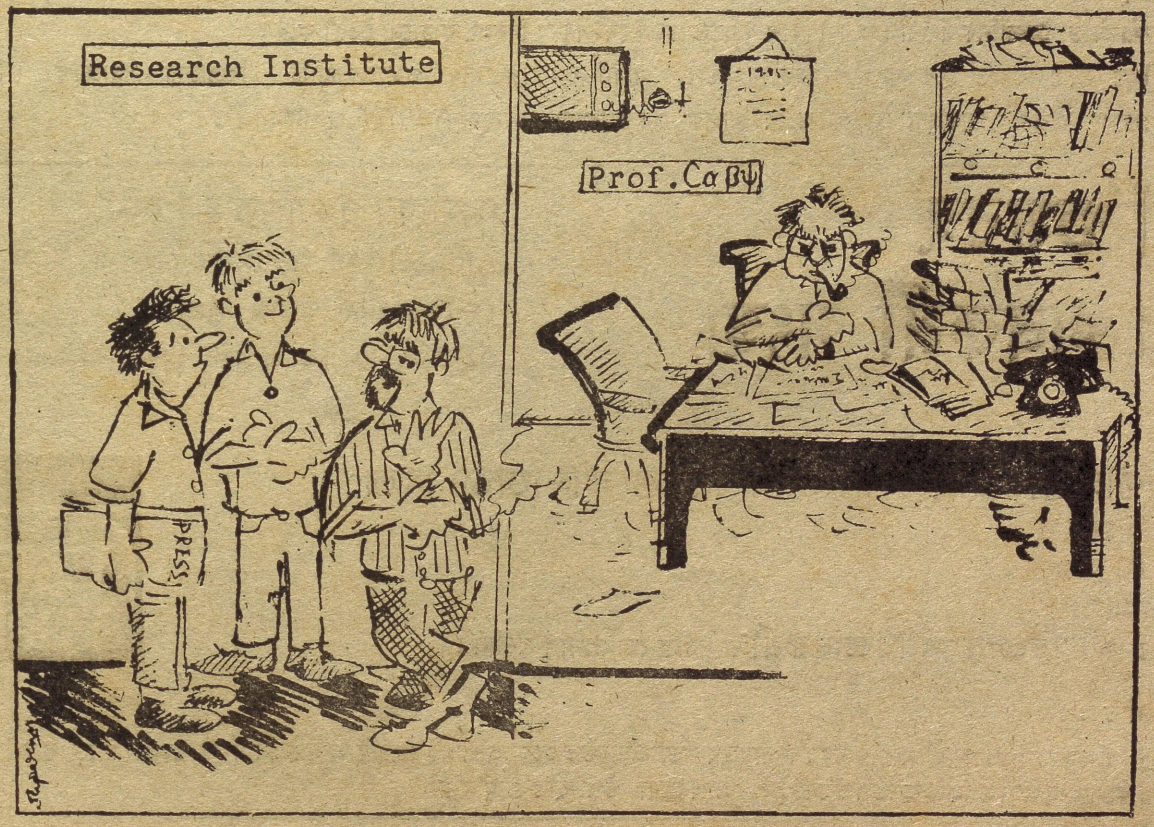

ঐ বুড়োটার থেকে আমার রিসার্চের স্ট্যাণ্ডার্ড অনেক ভাল। এ বছর ফিজিক্যাল রিভিউ থেকে ওঁর পাঁচটা পেপার রিজেক্ট হয়ে ফেরৎ এসেছে—আমার ফেরৎ এসেছে মাত্র তিনটে।

হিসেবেও দেখা দেয় অথবা পেশাগত স্বীকৃতিলাভের অপূর্ব সুযোগ হিসেবে দেখা দেয়। তাছাড়া, উচ্চস্তরের প্রতিযোগিতামূলক গবেষণার সূত্রপাত ঘটায় সংশ্লিষ্ট মননশীল বিষয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, যার ফলে বিষয়গুলি প্রসারতা হারাতে থাকে এবং খুব ধীরগতি উন্নতির ধারা গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠা লাভ, স্বীকৃতি অর্জনের তাগিদ, গবেষণাকে ক্রমশ কেন্দ্রীভূত করছে এবং অকের্ষণীয় সমস্যাগুলির প্রতি বিজ্ঞানীদের পক্ষপাতের দরুন অনুসন্ধানযোগ্য বিষয়বস্তুর সংখ্যা কমতেই থাকে। গবেষকরা নূতন ও প্রতিশ্রুতিময় ক্ষেত্রে থেকে ক্ষেত্র প্রবেশ করতে থাকে।

এমন কতগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলিকে ঠিক ধরা যায় না অথবা প্রতিটি আংশিক সমাধান নূতন প্রশ্নের জন্ম দেয়। এর ফলে এই ক্ষেত্রগুলি দীর্ঘদিন আর্কষণীয় হয়ে থাকে। কিন্তু যখনই প্রধান সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে গেছে বলে চিন্তা শুরু হয় তখনই সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের অবসান ঘটতে থাকে। গবেষকরা সাধারণত পড়তি ক্ষেত্র থেকে উঠতি ও প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে থাকে। এই ভাবে এক সঙ্গে বিভিন্ন গবেষকরা যখন ক্ষেত্রে পরিবর্তন করে ক্ষেত্রান্তরে যায় তখন তারা এক নূতন সামাজিক গোষ্ঠী গড়ে তোলে এবং চলতি সমস্যাগুলির নূতনতর সংজ্ঞা দিতে থাকে। এইভাবে জ্ঞানগত ও টেকনিক্যাল মান নূতনতর রূপ নেয়। নূতন নূতন অজ্ঞানতার ক্ষেত্রগুলিকে কেন্দ্র করে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির জন্ম হয়। এবং নূতনতর বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ডের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজস্ব সাহিত্য, নিজস্ব মননশীল অনুমান, নিজস্ব পৃষ্ঠপোষক ও সামাজিক নিয়ন্ত্রন প্রক্রিয়া গড়ে তোলেন।

মূলকের মতে বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলির বিকাশ বুঝতে হলে সেইসব সংগঠনগুলির তদন্ত করতে হবে যারা গবেষকদের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে। তাছাড়া, বিভিন্ন গবেষণামূলক কর্মকান্ডের মধ্যেকার সম্পর্কগুলিকে বুঝতে হবে এবং গবেষকদের ক্ষেত্রপরিবর্ত্তনের বিষয়টিকে পর্য্যালোচনা করে দেখা দরকার। বিজ্ঞানে মননশীলদের গতিময়তা নির্ভর করে তাদের দক্ষতা ও বিরল যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তাদের জ্ঞানগত দখলের ওপরে। গবেষকরা নূতন নূতন ধারণা ও পদ্ধতির উদ্ভাবনের মাধ্যমে মননশীলতার বৃদ্ধি ঘটায় এবং তারা প্রাগ্রসর ক্ষেত্র থেকে স্বল্প বিকশিত ক্ষেত্রের দিকেই বেশী আকৃষ্ট হয়, কারণ এতে ঝুঁকি কম। চলতি-গবেষণার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ধারণাগুলির রূপান্তরের মধ্য দিয়েও বিজ্ঞান বিকাশ লাভ করে।

অতঃপর, মূলকের মতে, যেহেতু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অপেক্ষাকৃত সুনির্দ্দিষ্ট এবং বিজ্ঞানীদের জ্ঞানগত প্রত্যাশাগুলি দ্ব্যর্থহীন সেহেতু তাদের এক কঠোর রক্ষণশীল ও আপোষহীন মননশীলতা বজায় রাখতে হয়। তবু অনেক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সরাসরি বিচার করা সম্ভব হয় না। তাই অনেক সময় গবেষণার ফলাফলগুলির নিশ্চয়তা নির্দ্ধারণ করার জন্য বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। এবং এগুলির তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত সুদীর্ঘ আলোচনা চালাতে হয়। এতে নূতন সংবাদ সৃষ্টি হয় যা সাময়িকীগুলি প্রকাশ করে। ক্রমে জ্ঞানগত মাপকাঠিতে পরিবর্তন ঘটে। গবেষকরা এইভাবে যখন নিজেদের ক্ষেত্রে গবেষণার গতিকে আর ফলপ্রদ মনে করে না অথবা নিজেদের দক্ষতার বাইরে বলে মনে করেন তখন তারা অন্য ক্ষেত্রে চলে যায়। অবশ্য যারা চলতি বিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে তারা থেকে যান এবং চলতি ধারাকে মদৎ দেন। এইভাবে ক্রমান্বয়ী পরিবর্ত্তনের প্রক্রিয়া সততই ক্রিয়াশীল থাকে এবং মূলকের মতে এই প্রক্রিয়াগুলি চক্রবৎ পরিবর্ত্তনের বিকল্প কাঠামো তৈরী করে।

[বর্তমান পর্যালোচনাটি 'বিজ্ঞানের সমাজতত্ত্ব' (বিজ্ঞান-সংস্কৃতি, জানুয়ারী 1979)-এর পরিমার্জিত রূপ।] □

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা

আমাদের প্রকাশিত দুটি বই—

না হিরোশিমা নাগাসাকি চাই না দাম পাঁচ টাকা

হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান দাম চার টাকা

52/9সি, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-12

এ্যান্টিনিউক্লিয়ার আর পলিউশন সংক্রান্ত কটি ভিডিও ফিল্ম

ওয়ার গেম্‌স

দি ডে আফটার

মিনামাতা

—এর জন্য **'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'**র দপ্তরে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বিজ্ঞপ্তি ঃ

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে আগামী বারোই আগষ্ট সোমবার বেলা সাড়ে চারটেয় রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে এপ্লায়েড ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে। আপনাদের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। ঃ সম্পাদক

পরিক্রমা

জল বাবা

কর্ণাটক বিধানসভা গত মে মাসে প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, যখন সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যে জলকষ্টের অবসানের জন্য এক যোগীর সাহায্যের প্রস্তাব আনা হয়। ইনি নাকি মন্ত্রবলে আকাশ থেকে বৃষ্টি নামাতে পারেন! স্বভাবতঃই সরকারের এই 'মহৎ' কাজে, যাতে বিনিপয়সায় দিব্যি জল পাওয়া যেত, বেশ কিছু বাগড়া দেবার লোক জুটে গেল। এবং ব্যাপারটা তখনকার মত স্থগিত রাখতে হ'ল।

কিন্তু মন্দ কী? ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এই নিদারুণ অগ্রগতির যুগে যখন খরা, বন্যা, বিদ্যুৎ, অচল টেলিফোন (অবশ্যই শহরে) ইত্যাদির কোনো সমাধান করা যাচ্ছে না, তখন এই রকম, 'জলবাবা,' 'বিদ্যুৎ বাবা' 'ফোন-বাবা' ইত্যাদিদের আবির্ভাব হ'লে মন্দ কী? শুধু বাঙ্গালোরের মত ওই সব বিজ্ঞানমনস্ক 'বদ' লোকগুলোকে নিয়েই যা সমস্যা!

নতুন শিক্ষা

নতুন একটি কাজ চালু হয়েছে। জেনে রাখা ভালো। ব্যাঙ্কিং কিংবা রেল বোর্ডের পরীক্ষার এসে যেতে পারে। আচ্ছা, CLASS শব্দটির মানে কি?

অনেকে বলবেন—এ আর এমন কি? ইস্কুলেই তো থাকে। যেমন আগে ছিল দশ ক্লাশ। এখন বারো। অনেকে খুশি হবেন না এ উত্তরে। কারণ আজকাল নাকি এই সব প্রশ্নের মাধ্যমে ক্যান্ডিডেটের সোসাল এওয়ারনেস জাজ করা হয়। তাই তারা বলবেন—এ হল সেই বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েত ক্লাশ।

উত্তরপত্রে দু'পক্ষই শূন্য পাবেন। এ CLASS সে class নয়। এ হ'ল শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিকতম সংযোজন। একটা বড় কথার সংক্ষিপ্ত নামকরণ। Computer Literacy And Studies in Schools। স্কুলে কম্পিউটার শিক্ষা বা কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষা। কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের শিক্ষা আধুনিকীকরণে প্রাথমিক উদ্যোগ। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ইংরেজী, অঙ্ক, বায়োলজি সব শেখা যাবে এই কম্পিউটারের মাধ্যমে। কিছুই আর শক্ত থাকবে না।

গত বছর সীমিত ভাবে শুরু হয়েছে প্রকল্প। আড়াইশো স্কুলে শুরু হওয়ার কথা। এ বছর আরো পাঁচশ স্কুলে। এইভাবে আগামী 1990 সালের মধ্যে দু'লক্ষ পঞ্চাশ হাজার স্কুলে কম্পিউটার শিক্ষা চলবে পুরোদমে। কম্পিউটার আসছে বৃটেন থেকে। প্রথম ক্ষেপে 900। —এরপর আরো আসবে। প্রকল্প ব্যয় প্রাথমিক ভাবে তিনশ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। আরো বাড়বে সন্দেহ নেই।

উদ্দেশ্য সাধু। তবে কাজটা বোধহয় আরো সহজ করা যেত। শিক্ষা দপ্তরের আমলারা এখনও পুরো আধুনিক হয়ে উঠতে পারেন নি বলে মনে হচ্ছে (কথাটা পি. এম. এর কানে পৌঁছলে চাকরি থাকলে হয়!)। আচ্ছা, অত শেখানোর বালাই রেখে কাজ কি? একটা করে "কম্পিউটার ক্যাপসুল" খুলির তলায় কোন খোঁদলে ইমপ্ল্যাণ্ট করে দেওয়া যায় না? কাজটা কত সহজ। নতুন-বন্ধু মার্কিনী কোন ফার্মের কাছ থেকে ক্যাপসুল গুলো আসবে। তারপর শুধু একটা অপারেশনকা ওয়াস্তা। খোকা-খুকুরা পনের ষোল বছর বয়স অবধি হেসেখেলে ফুর্তি করে বেড়াবে। তারপর নির্দিষ্ট বয়সে কাছাকাছি হেলথ সেণ্টারে গিয়ে COM-CAP টা লাগিয়ে এলেই হল। তবে সাবধান থাকতে হবে। সেখানে ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর লোকজন ওৎ পেতে থাকতেও পারে।

আর একটা ব্যাপারও জেনে রাখা ভালো

এক নজরে: শিক্ষা ক্ষেত্রে আছেনেই

খতিয়ান 1982

প্রাথমিক স্কুল-4,85,000
বাড়ী নেই-2,57,050
ব্ল্যাকবোর্ড নেই—40 শতাংশ
একজন শিক্ষক—35 ,,
লাইব্রেরী নেই—71 ,,

বিজ্ঞান গবেষণা, তুমি কার?

–আপনাদের গবেষণায় আমাদের কোনো উপকার হয়?
—হয়, হয়, Zান্তি পার না

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকলপনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে খরচের পরিমাণ প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি (ক'টা শূন্য?) টাকা, যা ভারতের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু গত কয়েক বছরে দেখা গেছে, ভারতের গবেষণা-গারগুলির গবেষণা সাধারণ মানুষের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কোনো মৌলিক গবেষণনাই সমাজের কল্যাণের উপযোগী কোনো প্রযুক্তির জন্ম দিতে পারে নি।

যুদ্ধু যুদ্ধু খেলা

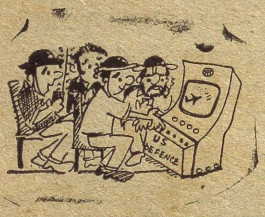

রেগনের ভি ডি ও খেলা

শত্রুপক্ষের বিমান-এর অবস্থান জানার জন্য রাডার-এ চোখ পেতে আর বসে থাকাতে হবে না। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কম্প্যুটার ও অন্যান্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে বিমান-বাহিনীকে উপহার দিয়েছে এক অভূতপূর্ব ভিডিও ব্যবস্হা, যার পর্দায় রাডারেরও নাগালের বাইরের শত্রু-পক্ষের বিমানদের দেখা যাবে। এবং তাকে সুইচ্ টিপে ধ্বংস করা যাবে তৎক্ষণাৎ। পর্দাতেও দেখ যাবে সেই ধ্বংসলীলা, ঠিক যেন বাচ্চাদের ভিডিও খেলা। শুধু আকাশেই নয়, মাটিতেও শত্রুপক্ষের তাৎক্ষণিক অবস্থান ও তাদের ধ্বংস এই ভিডিও 'খেলা'তে সম্ভব। এত সব চমৎকার খেলার ব্যবস্থা হয়েছে—এখন যদি রেগন-এর শিশু ভোলানাথদের খেলতে না দেওয়া হয়—তাহ'লে কিন্তু বড্ড অন্যায় হবে।

পুণ্যতোয়া গঙ্গা

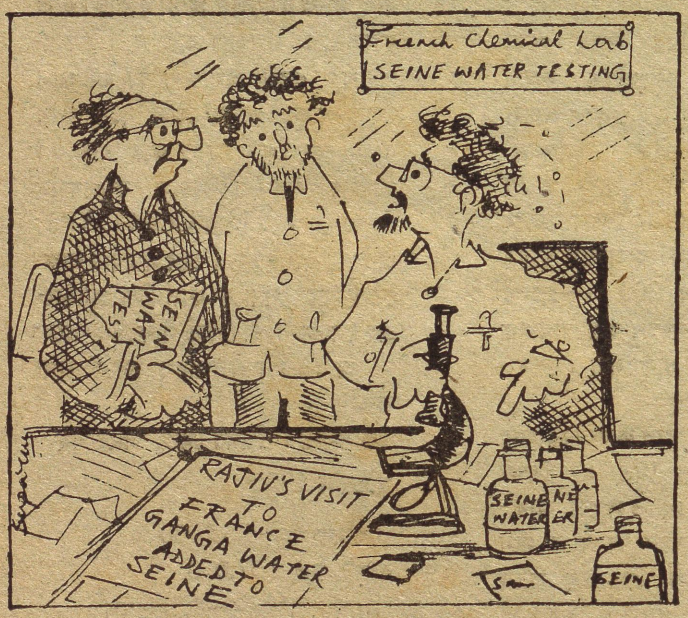

"শেইন-এর জল দূষিত হয়ে গেছে, স্যার!"

গঙ্গা নিয়ে ভাবনা ওপর থেকে চুঁইয়ে নীচ পর্যন্ত গড়িয়েছে। অনেকেই বলাবলি করছেন শুনছি, গঙ্গার দূষণ নাকি বিপদমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। পরিবেশ দপ্তর চিন্তিত। লক্ষ লক্ষ টাকার প্রজেক্ট স্যাংশন হয়েছে দূষণ পরিমাপের জন্য। প্রজেক্টের টাকায় চাকরী হচ্ছে। গঙ্গা প্রজেক্টের ছাপ মারা গাড়ীও চোখে পড়ছে পথেঘাটে এবং জলপথে। কিন্তু কাজে বোধহয় কর্তারা খুব সন্তুষ্ট নয়। তাই ডাক পড়েছে বিদেশীদের। ফ্রান্সের বিজ্ঞানী-কারিগর আসছেন গঙ্গা শোধনের উদ্দেশ্যে।

তাই ভাবনা নেই, আবার দেখা যাবে গঙ্গার টলটলে জলে মাছ খেলে বেড়াচ্ছে। আর আবর্জনার দুর্গন্ধের বদলে ফরাসী সেন্টের খুশবু ছড়াচ্ছে।

কিন্তু এহেন অবস্থায় গঙ্গার জল নিয়ে আরো কাণ্ড ঘটে চলেছে। গঙ্গা এক সময় নাকি ছিল মহাদেবের মাথায়। সেখান থেকে এখন একেবারে খবরের কাগজের হেডলাইনে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী ফ্রান্স সফরে গিয়ে সেখানকার প্রেসিডেণ্টের হাতে তুলে দিয়েছেন এহেন জল ভর্তি একটি ঘরা। কি তাৎপর্য কে জানে?

ওখানে আমাদের বন্ধুদের যেসব দিদিমা মাসীমা আছেন তারা কিন্তু খুব খুশি হবেন না এমন মহামূল্যবান দ্রব্যটি এমন অপাত্রে দান করায়। তবে ভাবনা নেই—অঢেল গঙ্গা জলের ব্যবস্থা ওখানেই হয়েছে। ফ্রান্সে ভারত মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দু'দেশের মৈত্রীর স্মারক হিসেবে কয়েক ঘরা পবিত্র (!) গঙ্গার জল ঢালা হয়েছে শেইন নদীতে। শেইন আর আলাদা রইল না গঙ্গার থেকে।

এখন প্রশ্ন—কাজটা কি ভাল হল?

বই পরিচিতি

কথা বলার সমস্যা ও প্রতিবন্ধী শিশু

সনৎ কুমার কর ঃ শ্রীভূমি পাবলিশিং কেম্পানী, কলকাতা-9, দাম--12টাকা

প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে বাংলা ভাষায় বই লেখার বিষয়ে শ্রী সনৎ কুমার কর পথিকৃৎ, এবং সেইজন্যেই এইরকম একটি প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারা যায় না। যদিও একথা সত্যি যে সব প্রথম-প্রচেষ্টাই যে সাফল্যের শিখরে পেঁছিবে তার কোন মানে নেই, তবু শ্রী কর যদি আর একটু যত্নবান হতেন তাহলে বোধ হয় "কথা বলার সমস্যা ও প্রতিবন্ধী শিশু" বাংলা ভাষায় লেখা একটি দলিল হতে পারতো।

বইটির নামকরণ থেকে আপাতদৃষ্টিতে দু'রকম অর্থ হতে পারে—এক, প্রত্যেক প্রতিবন্ধী শিশুর মধ্যে কথা বলার সমস্যা রয়েছে—এটা জনসাধারণকে জানানো; দুই, প্রতিবন্ধী শিশুর কথা বলার সমস্যার সমাধাণের চাবিকাঠি জনসাধারণের হাতে তুলে দেওয়া। লেখক অবশ্য উপর্যুক্ত দু'রকম অর্থেরই আভাষ রেখেছেন তাঁর নিবন্ধে, কিন্তু তা ঐ ধরনের নামকরণের পক্ষে যথেষ্ট মনে হয় না। বোধহয়, বইটির নাম 'প্রতিবন্ধী শিশু এবং কিছু সমস্যা' রাখা যেতে পারতো। স্বীকার করতে বাধা নেই যে 'কথা' হোল বুদ্ধির প্রকাশ এবং প্রয়োগের একটা মাধ্যম, কিন্তু একে অপরের সমার্থক—এটা ধরে নেওয়া ভুল হবে। কেননা, verbalisation এবং verbal expression এর মধ্যে সমানুপাতিক সম্পর্ক নাও থাকতে পারে—সত্যি কথা বলতে কি, না থাকাটাই স্বাভাবিক। এবং একথা সুস্থ লোকেদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

যদিও লেখক স্বীকার করেছেন যে প্রতিবন্ধী কথাটির একটি সঠিক সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে (অধ্যায় 8, পৃ ঃ 63) তবুও 'প্রতিবন্ধী শিশু' বলতে প্রকৃতপক্ষে উনি মানসিক প্রতিবন্ধীদেরই বোঝাতে চেয়েছেন, অবশ্য মূক বধিরদের যে অনুল্লেখ রেখেছেন তা নয়। এক্ষেত্রেও এই প্রতিবেদকের মনে হয়েছে যে শ্রী কর বোধ হয় আর একটু খোলাখুলি আলোচনা করলে ভালো করতেন। প্রথমতঃ, সব মূক-বধিরকে কি কথা শেখানো যায়? এখানেই এসে পড়ে শ্রেণীবিন্যাসের কথা। অর্থাৎ যারা সম্পূর্ণ মূক ও বধির, এবং যাদের সমস্যা আংশিক। লেখক বোধহয় এ বিষয়ে আলোকপাত করলে ভালো করতেন। দ্বিতীয়তঃ, মূক-বধিরদের কথা শেখানো (যাদের সমস্যা আংশিক) এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের কথা শেখানোর মধ্যে কৌশলগত তফাৎ থাকাটা স্বাভাবিক। কেননা, মূক-বধিরদের verbalisation process কার্যকরী থাকে কিন্তু verbal expression থাকেনা, আর মানসিক প্রতিবন্ধীদের গোড়ায় গলদ—অর্থাৎ, এদের verbalisation টাই হয় নেই, নয়তো ত্রুটীপূর্ণ। এই বিষয়টি লেখকের দৃষ্টি না এড়িয়ে গেলেই বইটির গুরুত্ব আরও বাড়ত।

শ্রী কর তাঁর ভূমীকায় স্বীকার করেছেন যে "মানস-মন্দিত শিশুদের বুঝতে হলে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশুর মানসিক বিকাশ সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হয়"। কিন্তু এই প্রতিবেদকের মনে হয়েছে যে তাঁর সেই স্বীকারোক্তির সম্পূর্ণ স্ফুরণ তাঁর বই-এর প্রথম অধ্যায়ে ঘটেনি। অধ্যায়ের শুরুতে—'প্রথম পাঁচবছর'—হয়তো পাঠকের মনে আশার সঞ্চার করবে যে তাঁরা জানতে পারবেন কী ভাবে শিশু প্রথম পাঁচ বছর কোন্ কোন্ স্তরের মাধ্যমে পারিপার্শ্বিকের সহায়তায় নিজেকে বিকশিত করে। অবশ্য নিবন্ধের শেষে সারণীটির (সারণী 1.1) উপকারীতা অনস্বীকার্য, তবু প্রতিবেদকের মনে হয়েছে যে এখানে বাবা-মার ভূমিকা নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ ছিল এবং তা হলে বইটির তথ্যগত ওজন বাড়ত।

শ্রী করের নিজের অভিমত ঃ "প্রবন্ধগুলির প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ" (ভূমিকা)। তবু তিনি পাঠকদের হাতে "যোগসূত্র" খুঁজে বার করার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে বোধহয় দ্বিতীয় অধ্যায় (মাতা-পিতার ভূমিকা) এবং চতুর্থ অধ্যায় (তোতলামি) অনভিজ্ঞ অনেক মাতা পিতার মধ্যে অহেতুক কিছু দুশ্চিন্তার জন্ম দিতে পারে। প্রথমতঃ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে মাতা-পিতার যে ধরনের ভূমিকার কথা বলা হয়েছে তাতে অর্থাৎ তার অভাবে শিশুর মধ্যে ব্যবহারিক সমস্যার উদ্ভব হতে পারে, কিন্তু তার জন্য মানসিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে পারে এমন ভাবাটা অতিসরলীকরণের পর্যায়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে এই অধ্যায়টি যদি পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বের স্থলাভিসিক্ত হোত (পৃঃ 36) তাহলে অনেক বেশী কার্যকরী হোত। দ্বিতীয়তঃ, যারা তোতলায় তারা কি প্রতিবন্ধী? লেখকের মতে "তোতলাদের মধ্যে 'বুদ্ধিতে খাটো'র সংখ্যা বেশী" (পৃঃ 25)। আবার 'তেতলাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাদের উদ্বেগ-প্রবণতা—'। প্রতিবেদকের প্রশ্ন--লেখক কি "বুদ্ধিতে খাটো" এবং 'মানসিক প্রতিবন্ধী' কে সমার্থক বলে মনে করেন? তাই যদি হয়, তাহলে লেখকের পরিষ্কার করে বলা উচিৎ ছিল কোন শ্রেণীর মানসিক প্রতিবন্ধী কে উনি "বুদ্ধিতে খাটো"র দলভুক্ত করেছেন। তা না হলে 'মানসিক প্রতিবন্ধী' এবং 'আবেগ প্রবণতা' পরস্পরবিরোধী বক্তব্য। কেননা, যাদের বুদ্ধি খুব অল্প তাদের মধ্যে আবেগ প্রবণতার বড়ই অভাব। তাই এই দুটি অধ্যায় হয় বিস্তারিত আলোচনা করলে নয়তো বাদ দিলে ভালো হোত।

পঞ্চম অধ্যায়টি অল্পবুদ্ধি শিশুদের নিয়ে প্রণীত। অনভিজ্ঞজনের কাছে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার মত একটি বিসদৃশ ঘটনা বোধকরি লেখকের অগোচরে থেকে গেছে। শ্রী কর মানসিক প্রতিবন্ধীদের যে ব্যবহারিক বিবরণ ("মুখে কি লেখা থাকে," পৃঃ 30) দিয়েছেন তা না থাকাটাই স্বাভাবিক সেইসব প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে যাদের বুদ্ধ্যাঙ্ক 50-এর ওপরে (ফলক 5.1 পৃঃ 28)। তাই মূলতঃ মানসিক প্রতিবন্ধকতাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়—এক, জৈব, দুই পারিবারিক। লেখকের বিবরণ মিলবে সেইসব প্রতিবন্ধীদের সাথে যাদের ক্ষেত্রে প্রথমটিই হোল প্রতিবন্ধকতার কারণ। তাছাড়া মানসিক প্রতিবন্ধী নিরূপণে লেখক কেবলমাত্র 'বুদ্ধি মাপা যন্ত্রের' ফলাফলের ওপরই গুরুত্ব দিয়েছেন কিন্তু শিশুর অভিযোজন ক্ষমতার কথা উল্লেখ করলে ভালো করতেন। কেননা, এ দুয়ের সমন্বয়েই মানসিক প্রতিবন্ধী নিরূপণের ক্রিয়া এখন সারা বিশ্বে প্রচলিত। "গোনার ব্যাপারে নতুন চিন্তা" নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে।

সত্যি কথা বলতে কি, সমস্ত বইটি পড়তে পড়তে এবং বিশেষ করে ষষ্ঠ অধ্যায়টি (বুদ্ধি মাপার গল্প) পড়বার সময় একটা জিজ্ঞাসা বারবার মনে ঘোরাফেরা করে—আসলে বইটি কাদের উদ্দেশ্যে লেখা? যদি প্রফেসনালদের জন্য হয়, তাহলে বলতেই হয় যে বইটি তাঁদের কোনভাবেই সাহায্য করবে না। আর যদি জনসাধারণের অবগতির জন্যে হয়, তাহলে বলতে হয় ষষ্ঠ অধ্যায়ের কোনও যৌক্তিকতা নেই। কারণ, এই সমস্ত "যন্ত্র" প্রফেসনাল ছাড়া অন্য কেউ পেতে পারেন না। আর তাই যদি হয়, তাহলে অযথা "বুদ্ধি মাপার গল্প" লোককে শুনিয়ে লাভ কি? শুধুমাত্র জনসাধারণের অবগতির জন্যে "গল্প"টিকে অনেকটা সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারতো।

আত্মমগ্ন শিশুর সমস্যা এবং প্রতিবন্ধী শিশুর সমস্যা এবং সমাধানের উপায় একরকম নয়। তাই আত্মমগ্ন শিশুকে প্রতিবন্ধী শিশুর সাথে মিশিয়ে ফেলাটা উচিৎ নয়। প্রতিবেদকের মতে এই অধ্যায়টিও বাদ গেলে ভুল বোঝাবুঝির বোঝাটা কম হোত।

শ্রী কর নিজেই বলেছেন যে 'মানসিক প্রতিবন্ধী বা প্রান্তিক প্রতিবন্ধীরা মনরোগী নয়'। এ বিষয়ে লেখকের সাথে একমত না হওয়ার কোনও কারণ নেই। তবে "কথা বলার সমস্যা ও প্রতিবন্ধী শিশু" পড়ার পরে অনভিজ্ঞ পাঠকের সংশয়ের দোলক কোন্‌দিকে যাবে তা বলা দুরূহ।

অ. কৃ. ভ

বিদ্যুতের রূপকথা ঃ অজয় চক্রবর্তী

পুথিপত্র 9, এ্যান্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-700009 দাম—দশ টাকা

আজ থেকে কয়েক বছর আগেও বিজ্ঞানীদের ও তাঁদের আবিষ্কারকে বিষয়বস্তু করে বাংলা ভাষায় লেখা বই বা পত্রিকা বিশেষ একটা চোখে পড়ত না। ইদানিং কালে এই ধরনের বইপত্র বাজারে দেখা যায়। এই ধরনের প্রয়াস অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। এই রকম একটা বই 'বিদ্যুতের রূপকথা'। বইটি সহজ সরল ভাবে লেখার জন্য যারা বিজ্ঞানের ছাত্র নন এরকম বিজ্ঞানানুরাগীদের কাছে নিঃসন্দেহে একটা মূল্যবান উপহার। এমনকি যারা বিজ্ঞানের ছাত্র তাদেরও অনেকেই উপকৃত হবেন। আমাদের পাঠ্য বইয়ে যে ধরনের বিজ্ঞান চর্চা হয় তার সবটাই লেখা হয় কিছু সূত্র, তত্ত্ব, এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে বিষয়বস্তু করে। সেখানে উপস্থাপিত করা হয় না বিজ্ঞানীর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার নানান দিক। দেখান হয় না বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের সঙ্গে পুরাতন ধ্যান-ধারণার সংঘাত। দৃষ্টান্ত ঃ গ্যালিলিও, কোপারনিকাস প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের সময় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংঘাত। ফলস্বরূপ, আমরা বিজ্ঞানকে সামগ্রিকভাবে ভাবতে পারি না, এর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বা দর্শনকে আত্তীকরণ করতে পারি না। তাই মনে হয় এই ধরনের বইপত্র পাঠ্যপুস্তকের পরিপূরক হিসাবে খুবই দরকারী।

লেখক ভূমিকায় বইটির নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখা করেছেন। এখানে তিনি দুটো পরস্পরবিরোধী ধারাকে অনেকটা যেন জোর করেই মেলানোর চেষ্টা করেছেন। রূপকথার রাজ্যে রাক্ষস-খোক্ষস, দত্যি-দানোরা পলকে অবিশ্বাস্য সব কান্ড বাধায়, সোনার কাঠির ছোঁয়ায় অচেতন রাজকুমারীর চেতনা ফেরে—কিন্তু বিজ্ঞানের রাজ্যে এ ধরনের কোন সোনার কাঠি আছে বলে জানা নেই, যার স্পর্শে অসম্ভব ক্ষণিকের মধ্যে সম্ভব হয়ে উঠবে। অবশ্য বিজ্ঞানের আবিষ্কার অনেক সময়ই কল্পনাকে ছাপিয়ে যায়, যা রূপকথার চেয়েও বিস্ময়কর মনে হয়। তাই বলে কিন্তু রূপকথা আর বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে একসঙ্গে মেলানো যায় না। এই সত্যই ধরা পড়ে যখন লেখক ভূমিকায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলেন "বিজ্ঞানের কোন সূত্রই আকাশ থেকে পড়ে না। সমস্ত আবিষ্কারের জন্য পটভূমি রচিত হওয়া চাই, ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়া চাই।" অথচ বইয়ের মূল সুরে এই বাস্তব পটভূমি খোঁজার চাইতে গল্পকথার উপর জোর দেওয়ারই যেন ঝোঁক বেশী।

এছাড়া বইটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতিও চোখে পড়ে। যথোপযুক্ত শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখক বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন বলে মনে হয় না—যেমন তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের পরিবর্তে বিদ্যুৎ তরঙ্গের কথা বলেছেন। কয়েকজন বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের সময় উল্লেখ করা হয়নি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ঃ অধ্যাপক পিটার সুশাসেন ব্রোকের লিডেন জার, ভোল্টার তড়িৎ-কোষ, ইত্যাদি। ঠিক একইভাবে বাদ পড়ে গেছে মার্কনি প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্তির কথা। কুলম্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা যাঁরা তড়িৎ এবং চুম্বক সম্পর্কে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বা গাণিতিক সম্পর্ক নিরূপণ করেছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে দু-চার কথা বললে বোধহয় ভাল হত। এছাড়া 67 পৃষ্ঠায় 8-ম লাইনে 'তড়িৎক্ষেত্রে'-র পরিবর্তে 'চৌম্বক ক্ষেত্রে' হবে, 99-পৃষ্ঠায় 27 লাইনে গ্রাহক যন্ত্রের পরিবর্তে প্রেরক যন্ত্র হবে। এ ছাড়াও কিছু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে যা থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া কঠিন, যেমন 21-পৃষ্ঠায় বলেছেন 886 ফুট লম্বা সুতোর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎকে পরিবাহিত করা হয়েছিল। কিন্তু সাধারণভাবে আমরা জানি সুতো অপরিবাহী বলে এর মধ্যে দিয়ে 'তড়িৎ পরিবাহিত করা যায় না। তাছাড়া ঘর্ষণের দ্বারা তড়িতাহিত করণ আর তড়িৎ পরিবাহিত করা একই কথা নয়। অনুরূপ আর একটা মন্তব্য করেছেন 99 পৃষ্ঠার 15 লাইনেঃ ডায়ড্ ভালভে তড়িৎপ্রবাহ একমুখী হয় ইলেকট্রনের বিশেষ তড়িৎধর্মীতার জন্য। কিন্তু এটা সম্ভব হয় ইলেকট্রনের বিশেষ তড়িৎধর্মীতার জন্য নয় ডায়ড ভালভের গঠনের জন্যই। সুতরাং এটা ডায়ড ভালভেরই ধর্ম।

পরিশেষে লেখক বিজ্ঞানের অপব্যবহার সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা আজকের দিনে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি যেমন একদিকে মানবসভ্যতার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে অন্যদিকে সামরিক সাজসরঞ্জামে বিজ্ঞানকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে আমাদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বকেই অনিশ্চিত করে তুলেছে। এইদিকে নজর রেখে আজ আমাদের ভাববার দিন এসেছে যে বিজ্ঞানের সমস্ত আবিষ্কারই মানবকল্যাণের জন্য কি না। □

প্রভাত মন্ডল

R.N.34929/79

YEAR 8 NUMBER 6
YEAR 9 NUMBER 1

VIGYAN-O-VIGYANKARMI
c/o D. S. Enterprise.
52/9C, B.B. Ganguli Street, Cal-12
May-June & July-Aug. 1985

পড়ুন ও পড়ান

☐ উৎস মানুষ ☐ প্রগতিবার্তা (কল্যাণী) ☐ বিজ্ঞান মণীষা (মেদিনীপুর) ☐ অঙ্কুরে শুরু ☐ লোকবিজ্ঞান (কাশীনগর) ☐ অন্বেষা ☐ অহল্যা ☐ গণস্বাস্থ্য (বাংলাদেশ) ☐ Manushi (দিল্লী) ☐ Parents and Pedagogues (উড়িষ্যা) ☐ Science for the People (USA) ☐ Medico Friends' Circle Bulletin (পুণে) ☐ জনবিজ্ঞান (আসাম) ☐ বিজ্ঞান ও সমাজ ☐ জ্ঞান বিচিত্রা (আগরতলা) ☐ জ্ঞান ও বিজ্ঞান ☐ Socialist Health Review ☐ BASWI (দিল্লী) ☐ মাটির কাছাকাছি ☐

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুস্তিকা

☐ মনোরোগ, মনোরোগী, মনোচিকিৎসা ও একটি নতুন পথের খোঁজে ('উৎস মানুষ' ও 'মানস'-এর যৌথ উদ্যোগে প্রচারিত ও মুদ্রিত, যোগাযোগ P 239A কিম্বার স্ট্রীট, কলিকাতা-17) ☐ কল্যাণী ঘোষপাড়ার সতীমার মেলা ও কর্তাভজা সম্প্রদায়—মনীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার (কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার 100, বসন্ত বাবু রোড, কাঁচরাপাড়া) ☐ মালা বাড়ে রোগ সারে—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় (উৎস মানুষ, বি ডি 494 সল্ট লেক, কলি-64) ☐ গণবিজ্ঞান আন্দোলন কি ও কেন-একটি প্রাথমিক খসড়া—মনীন্দ্রনারায়ন মজুমদার (অমূল্য মণ্ডল কর্তৃক বি 6/119 কল্যাণী, নদীয়া থেকে প্রকাশিত) ☐ পরিবেশ দূষণ—স্বপন কুমার শীল (কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার) ☐ না হিরোসিমা নাগাসাকি চাই না (দ্বিতীয় সংস্করণ) সৌমেন গুহ (পঃ বঃ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা) ☐ হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান (বি-ও-বি সংকলন, পঃ বঃ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা) ☐ আণ্ত্রিক '84 : মানুষের তৈরী মহামারী—নাজেস আফরোজ (বাউলমন 28, বালীগঞ্জ গার্ডেন্স, কলি-19) ☐ প্রশ্ন-উত্তরে বাছ বিচার (বাউলমন) ☐ বাংলাদেশের গণস্বাস্থ্য থেকে সংকলন (বাউলমন) ☐ বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান-অপবিজ্ঞান (সংকলন, উৎস মানুষ) ☐ বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (সংকলন, উৎস মানুষ) ☐ শেকল ভাঙার সংস্কৃতি (সংকলন, উৎস মানুষ) ☐ কারেন সিল্কউড (মহিলা পাঠাগার, 57B পিয়ারী মোহন রায় রোড, কলি-29) ☐ নারী মুক্তি আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় (মহিলা পাঠাগার) ☐ প্রমিথিউসের পথে (সংকলন, উৎস মানুষ) ☐ দূষণ : ত্রিবেণী থেকে কলকাতা—রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় (পিপলস ফোরাম, 32 বি সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলিকাতা-6) ☐ যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু (ভূপাল কমিটি 11 ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট, কলিকাতা-1) ☐ ভূপাল, ঘটনা না দুর্ঘটনা ? (গণ সাংস্কৃতিক সংস্থা, নতুন বাজার, সোদপুর 743178) ☐ মানুষের জন্য ওষুধ না ওষুধের জন্য মানুষ (তৃতীয় মুদ্রণ, ড্রাগ ফোরাম, S3/5 শ্রাবণী, সল্ট (লেক) ☐ Nuclear Bulletin ☐

রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে লক্ষ্মী প্রেস, 15/সি, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-9 হইতে মুদ্রিত

দুইটি সন্তানের জন্ম সময়ের মধ্যে তিন বছরের ব্যবধান রাখুন

নিরোধ কপার টি খাবার বড়ি

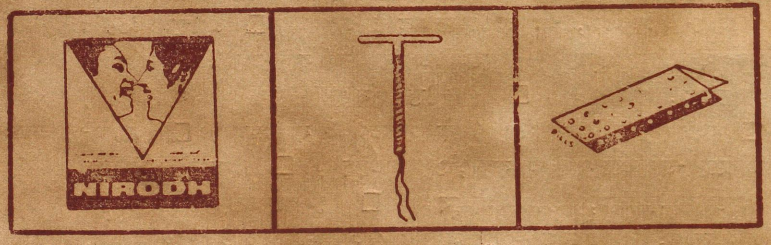

যে কোন একটি পদ্ধতি বেছে নিন

davp 84/225